القول السديد شرح كتاب التوحيد
بنغالي

তাওহীদের সরল ভাষ্য

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

100 هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠١٦ - فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠١٦

جمعية الدعوة بالزلفي

তাওহীদের সরল ভাষ্য

القول السديد في شرح كتاب التوحيد – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

القول السديد في شرح كتاب التوحيد

ترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١١/١٤٤٢هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

القول السديد في شرح كتاب التوحيد / شعبة توعية الجاليات بالزلفي – الزلفي ١٤٢٤

.. ص؛ .. سم

ردمك : ٩-٢١-٨٦٤-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١ -التوحيد أ. العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٤/٣٦٥٠

رقم الإيداع : ١٤٢٤/٣٦٥٠

ردمك : ٩-٢١-٨٦٤-٩٩٦٠

القول السديد

তাওহীদের সরল ভাষ্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]

“আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।” (সূরা যারিয়াত ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাক।” (সূরা নাহল ৩৬) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ [الإسراء: ٢٣]

“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।” (ইসরা ২৩) তিনি অন্য আয়াতে বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦]

“আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না।” (সূরা নিসা ৩৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام:١٥١]

"তুমি বল, এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ সব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই। নির্লজ্জতার কাছেও যেও না, প্রকাশ্যে হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝো।" (আনআম ১৫১) ইবনে মাসঊদ-ﷺ-বলেন,

((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتِمَةُ فَلْيَقْرَأْ: قوله تعالى﴿ قُل تَعَا لَوْا اتْل مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أن لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مَسْتَقِيمًا﴾

"যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ-ﷺ-এর সেই উপদেশকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করে, যার উপর তাঁর সোহর মারা আছে, সে যেন মহান আল্লাহর এই আয়াত পড়ে নেয়, "তুমি বলো এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ সব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করো

না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরক আহার দেই। নির্লজ্জতার কাছেও যেও না, প্রকাশ্যে হোক কিংবা অপ্রকাশ্যে, অন্যায়ভাবে এমন প্রাণীকে হত্যা করো না; যাকে হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তোমা-দেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুঝো।" এই আয়াত থেকে নিয়ে ১৫৩ নং আয়াত পর্যন্ত "নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না।"

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا)) [رواه البخاري ومسلم]

মুআ'য ইবনে জাবাল-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপর নবী করীম-ﷺ-এর পিছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "হে মুআ'য, তুমি কী জানো বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার কি এবং আল্লাহর উপরে বান্দাদের আবদার কি?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি-ﷺ-বললেন, "বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার হল, তারা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দাদের দাবী হল, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ সুসংবাদ কি

আমি লোকদের দিবো না? তিনি বললেন, "তাদের এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে এরই উপর তারা ভরসা করে বসবে।" (বুখারী-মুসলিম)

যে বিষয়গুলি জানা গেলঃ

১। মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

২। ইবাদতই হল প্রকৃত তাওহীদ। কারণ, দ্বন্দ্ব এ ব্যাপারেই।

৩। তাওহীদবিহীন ইবাদতই হয় না। আর এ ব্যাপারেই বলা হয়েছে, ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ (এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি)।

৪। রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য।

৫। রেসালাত সলক উম্মতের জন্যই।

৬। সমস্ত নবীদের দ্বীন একই ছিল।

৭। তাগুতকে অস্বীকার না করলে ইবাদত কোনো ইবাদত বলে গণ্য হয় না। কারণ, এ ব্যাপারেই বলা হয়েছে, فمن يكفر با الطاغوت (যে তাগুতকে অস্বীকার করে)।

৮। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসবের ইবাদত করা হয়, তা সবই তাগুত।

৯। সালাফের নিকট সূরা আনামের সুস্পষ্ট তিনটি আয়াতের বড় মর্যাদা ছিল। যাতে দশটি মসলা-মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমে আনা হয়েছে শির্ক থেকে নিষেধ প্রদান।

১০। সূরা ইসরাতে এমন কিছু সুস্পষ্ট আয়াতের উল্লেখ হয়েছে, যাতে রয়েছে ১৮টি মসলা-মাসায়েল আর তা আরম্ভ হয়েছে আল্লাহর এই বাণী দিয়ে,

﴿لا تَجْعَل مَعَ اللهِ إلها آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوما مَخْذُولا﴾ [الاسراء:٢٢]

“স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে।” আর শেষ হয়েছে তাঁর এই বাণী দ্বারা,

﴿وَلا تَجْعَل مَعَ اللهِ إلها آخَرَ فَتُلقَى فِي جَهَنَّمَ مَلوما مَدْحُورا﴾ [الاسراء: ٣٩]

“আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য স্থির করো না, তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।” আর এই মসলাগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন তাঁর এই বাণী দ্বারা,

﴿ذَلكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الحِكْمَةِ﴾

“এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা তোমার পালনকর্তা তোমাকে অহী মারফত দান করেছেন।”

১১। সূরা নিসার আয়াতের উল্লেখ, যা দশ অধিকার বিশিষ্ট আয়াত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এই আয়াতকেও আল্লাহ তাঁর এই বাণী দ্বারা শুরু করেছেন,

﴿وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئا﴾

“আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না।”

১২। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মৃত্যুর সময়ের অসীয়ত সম্পর্কে সতর্কতা।

১৩। আমাদের উপর আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে জানা।

১৪। আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার সম্পর্কে জানা, যখন তারা তাঁর অধিকার আদায় করবে।

১৫। এই ব্যাপারটা অধিকাংশ সাহাবীরা জানতেন না।

১৬। কোনো ভাল উদ্দেশ্যে জ্ঞান গোপন করা যায়।

১৭। মুসলিমকে এমন সুসংবাদ দেওয়া ভাল, যাতে সে আনন্দ বোধ করে।

১৮। আল্লাহর ব্যাপক রহমতের উপর ভরসা করে বসে থাকা আশঙ্কাজনক।

১৯। জিজ্ঞাসিত বিষয় না জানলে বলা, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।'

২০। মানুষের মধ্যে কিছু মানুষকে বিশেষ কোনো জ্ঞানে নির্দিষ্ট করা জায়েয।

২১। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-গাধার উপর সাওয়ার হতেন, এ থেকে তাঁর নম্রতার প্রমাণ হয় যে, তিনি এবং পিছনে অন্যকে বসাতেন।

২২। সাওয়ারীর পিছনে বসা জায়েয।

২৩। মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর ফযীলত।

২৪। এই মসলাটির গুরুত্ব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

'কিতাবুত তাওহীদ' নামে নামকরণই বলে দেয় যে, এই কিতাবের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি উদ্দেশ্য কি। অর্থাৎ, এই কিতাবে রয়েছে তাওহীদুল উলূহিয়্যা ও ইবাদতের বর্ণনা। এই তাওহীদের বিধান, তার শর্তাবলী, তার ফযীলত, তার প্রমাণাদি, মূল বিষয় ও তার বিশ্লেষন, উপায়-উপকরণ, তার উপকারিতা ও দাবী, কিসে তাওহীদ বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়, কিসে হ্রাস পায় ও দুর্বল হয় এবং কিসে তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে, এ সবেরই বর্ণনা এই কিতাবটির মধ্যে রয়েছে।

জ্ঞাতব্য যে, তাওহীদ এই জ্ঞান রাখা ও স্বীকার করার নাম যে, প্রতি-পালক তাঁর পরিপূর্ণ গুণসহ এক ও একক। অনুরূপ এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাঁর মাহাত্ম্যে ও গৌরবে এক ও একক এবং কেবল তাঁকেই

ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা। এই তাওহীদ তিন প্রকারের। যথা,

প্রথমতঃ তাওহীদুল আসমা অসসিফাত

আর তা হল, এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মহিমময় আল্লাহ এক ও একক। মাহাত্ম্য, গৌরব ও সৌন্দর্যসহ অন্য সকল গুণে সবদিক দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ। এতে কোনোভাবেই কেউ তাঁর শরীক নেই। অর্থাৎ, কিতাব ও সুন্নাতে যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী তার অর্থ ও বিধানসহ আল্লাহ স্বীয় নিজের জন্য অথবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন,তার কোনো কিছুর বিকৃতি, অস্বীকৃতি এবং পরিবর্তন ও সাদৃশ্য পেশ না করে সেই-ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা, যা তাঁর মাহাত্ম্য ও গৌরবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর তাঁর পূর্ণতা পরিপন্থী যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি নিজেকে অথবা তাঁর রাসূল তাঁকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে মুক্ত মনে করা।

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ

অর্থাৎ, বান্দা এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহই একমাত্র সকল সৃষ্টির প্রতিপালক, রুজিদাতা এবং পরিচালক। যিনি বহু নিয়ামত দিয়ে সৃষ্টির লালন-পালন করছেন। তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদের যথা, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারীদের সঠিক আক্বীদাহ, সুন্দর চরিত্র, উপকারী জ্ঞান এবং নেক আমল করার তাওফীক দিয়ে লালন-পালন করে থাকেন। আর এই তারবিয়াতই হল অন্তর ও আত্মার জন্য লাভদায়ক। আর এই তারবিয়াতই বয়ে আনবে ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য।

তৃতীয়তঃ তাওহীদে উলূহিয়্যাহ

একে তাওহীদে ইবাদতও বলা হয়। অর্থাৎ, এই জ্ঞান রাখা ও স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহই তাঁর সকল সৃষ্টির এবাদত ও উপাসনার অধিকারী। তাঁকেই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য মনে করা এবং দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দষ্ট করা।

শেষোক্ত এই তাওহীদ উল্লিখিত উভয় তাওহীদের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উভয় তাওহীদকেই শামিল করে থাকে। কারণ, উপাস্য হওয়া এমন এক গুণ, যার মধ্যে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও তাঁর রুবূবিয়্যাত সহ তাঁর সকল পূর্ণ গুণ শামিল থাকে। কেননা, তিনি এমন উপাস্য ও মাবূদ, যিনি মাহাত্ম্য ও গৌরবের গুণে গুণান্বিত। যিনি দান করেছেন তাঁর সৃষ্টিকে বহু অনুগ্রহ ও করুণা। কাজেই তিনিই যখন সমস্ত পূর্ণ গুণের অধিকারী ও প্রতিপালকও তিনিই, তখন তিনি ব্যতীত আর যে কেউ ইবাদতের অধিকারী হতে পারে না, এ কথা শিরোধার্য।

প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল এই তাওহীদের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো। লেখক এই পরিচ্ছদে এমন কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লখে করেছেন, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, তারা যেন তাঁরই এবাদত করে এবং তাঁরই জন্যে দ্বীনকে নির্দিষ্ট করে। আর এটা হল তাদের উপর আল্লাহর অপরিহার্য অধিকার।

প্রত্যেক আসমানী কিতাব এবং সকল রাসূল এই তাওহীদেরই দাওয়াত দিয়েছেন এবং এর পরিপন্থী বিষয় শির্ক থেকে নিষেধ প্রদান করেছেন। বিশেষ করে রাসূলে করীম-ﷺ-এবং এই কুরআনও তাওহীদের নির্দেশ দিয়েছে, তা ফরয করেছে এবং বড় গুরুত্বের সাথে তার বর্ণনা দিয়েছে

ও জ্ঞাত করিয়েছে যে, এই তাওহীদ ব্যতীত মুক্তি, পরিত্রান এবং সৌভাগ্য লাভের কোনো উপায় নেই। কুরআন ও হাদীস, বিবেক-বুদ্ধি পৃথিবীর দিগন্তে বিদ্যমান যাবতীয় জিনিস এবং সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব, এগুলি এমন অকাট্য দলীল, যা তাওহীদ ও তার ওয়াজিব হওয়ার কথাই প্রমাণ করে। আর এটা হল দ্বীনের সমস্ত নির্দেশর মধ্যে মূল ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। অনুরূপ এটাই হল দ্বীন ও আমলের মূল ভিত্তি।

তাওহীদের ফযীলত, তা পাপের কাফফারা হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ لَمْ يَلبَسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الانعام:٨٢]

“যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শির্কের সাথে মিশ্রিত করে না।” (আনআম ৮২) উবাদা ইবনে সামিত-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ)) أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: ((فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ))

“যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও

রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়ামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন। (বুখারী-মুসলিম) বুখারী-মুসলিমেই ইতবান-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, “নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিষ্ঠার সাথে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে।”

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “মূসা-ﷺ-আল্লাহকে বলেছিলেন,

((يَا رَبِّ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصَّنِي بِهِ، قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) رواه ابن حبان والحاكم وصححه.

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন কিছু বিষয় শিখিয়ে দাও, যা দিয়ে আমি তোমাকে স্মরণ করব এবং তোমার নিকট প্রার্থনা করব। তখন আল্লাহ বললেন, “হে মূসা, বল, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার সকল বান্দা তো এটা বলে। আমি এমন কিছু চাই যা আমার জন্য নির্দিষ্ট হবে। আল্লাহ বললেন, “হে মূসা, সপ্তাকাশ এবং আমি ব্যতীত সেখানে বসবাসকারী সকলকে ও সপ্ত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখ, আর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে যদি আর এক পাল্লায় রাখ, তবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।” (ইবনে হিব্বান ও

হাকিম) ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী শরীফে আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((قال الله تعالى: يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لأَتَيْتُكَ بِقُرابِهَا مَغْفِرَةً))

"আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম সন্তান, তুমি যদি যমীন ভরতি গোনাহ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হও, আর আমার সাথে যদি কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি তোমাকে যমীন ভরতি ক্ষমা দান করব।"

কতিপয় মসলা জানা গেল

১। আল্লাহর অনুগ্রহ বিস্তৃত।
২। আল্লাহর নিকট তাওহীদের নেকী অনেক।
৩। তাওহীদ থাকলে অন্যান্য গোনাহ ক্ষমা হয়।
৪। সূরা আনআ'মের আয়াতের ব্যাখ্যা।
৫। উবাদা ইবনে সামেত-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা।
৬। যখন ইতবান থেকে বর্ণিত হাদীসের বিষয় ও তার পরের বিষয়কে একত্রে জমা করবে, তখন তোমার নিকট 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং যারা ধোঁকায় পড়ে আছে, তাদের ত্রুটি তোমার নিকট ধরা পড়ে যাবে।
৭। ইতবান-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত শর্তের উপর সতর্ক করা হয়েছে।

৮। নবীগণও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফযীলত সম্পর্কে অবহিত করণের মুখাপেক্ষী ছিলেন।

৯। এ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সমস্ত সৃষ্টি থেকে বেশী ভারী হবে, অথচ এই কালেমার অনেক পাঠকের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে।

১০। প্রমাণ হলো যে, যমীনেরও আসমানের মত সাতটি স্তর আছে।

১১। এও জানা গেলো যে, আসমান ও যমীনে অবস্থানকারী আছে।

১২। আল্লাহর গুণের কথা প্রমাণ হয়, যদিও আশআরীরা তা মানে না।

১৩। যখন তুমি আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসের বিষয় সম্পর্কে জেনে যাবে, তখন তুমি ইতবান-ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত, 'আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিষ্ঠার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেছে। কথার সঠিক অর্থ জেনে যাবে যে, শির্ক ত্যাগ করার কথা শুধু মুখে বললে হবে না।

১৪। ঈসা-ﷺ-ও মুহাম্মাদ-ﷺ-কে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে একত্রে আনার বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা।

১৫। ঈসা-ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান লাভ যে তিনি আল্লাহর এক বাক্য ছিলেন।

১৬। তাঁর রূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার বৈশিষ্ট্য জানা গেল।

১৭। জান্নাত ও জাহান্নামের উপর বিশ্বাসের ফযীলত সম্পর্কে জানা গেল।

১৮। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, 'যে নিষ্ঠার সাথে লা-ইলাহা ইল্লা ল্লাহ' পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাতে তার আমল যাই হোক না কেন- কথার অর্থ জানা গেল।

১৯। জানা গেলো যে, দাঁড়ির দু'টি পাল্লা হবে।

২০। আল্লাহর ‘অজহ’ মুখমন্ডল আছে, এ ব্যাপারে অবগত হওয়া গেল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আগের অধ্যায়ে তাওহীদের আবশ্যকতা এবং তা সকল বান্দার উপর ওয়াজিব হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর, এই অধ্যায়ে তার ফযীলত, তার প্রশংসনীয় প্রভাব এবং তার সুন্দর পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ কথার উল্লেখ করেছেন যে, কোনো জিনিসই তাওহীদের মত সুন্দর প্রভাব এবং তার মত বিভিন্ন প্রকারের ফযীলত রাখে না। কেননা, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হল, এই তাওহীদ ও তার ফযীলতের ফল। অনুরূপ গোনাহ মাফ হওয়া ও গোনাহের জন্য কাফফারা হওয়া তাওহীদের ফযীলত ও তার সুফলেরই কিছু অংশ।

এটাও তাওহীদের ফযীলতের আওতায় পড়ে যে, তা হল দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট ও শাস্তি দূরীভূত হওয়ার ও দূরীকরণের সব থেকে বড় মাধ্যম। তাওহীদের সব থেকে বড় লাভ হল, তা তাওহীদবাদী (পাপী)কে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে দিবে না, যদি অন্তরে সামান্য পরিমাণও তাওহীদ থাকে।

এটাও তাওহীদের ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত যে, তাওহীদবাদী পূর্ণ হেদায়ত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে।

তাওহীদের আরো ফযীলত হল, এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর থেকে পুরস্কার লাভ করা যায়। আর মানুসের মধ্যে সেই ব্যক্তিই মুহাম্মাদ-ﷺ-এর সুপারেশি লাভে ধন্য হবে, যে আন্তরিকতার সাথে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।

তাওহীদের সব থেকে বড় ফযীলত হল, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় কথা ও কাজ গ্রহণ হওয়া, তাতে পূর্ণতা লাভ করা এবং তার নেকী অর্জন

হওয়া, সব কিছুই এরই (তাওহীদের) উপর নির্ভরশীল। কাজেই তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা যত মজবুত হবে, যাবতীয় আমল তত পূর্ণতা লাভ করবে।

এটাও তাওহীদের ফযীলত যে, তা বান্দার জন্য ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা আসান করে দেয় এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। সুতরাং যে আল্লাহর উপর ঈমান আনায় ও তাওহীদে নিষ্ঠাবান হবে, তার জন্য অনেক ভাল কাজ সম্পাদন করা সহজ হয়ে যাবে। কেননা, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নেকীর আশা রাখে। অনুরূপ প্রবৃত্তির চাহিদার পাপ থেকে বাঁচাও তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কারণ, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।

এও তাওহীদের বৈশিষ্ট্য যে, যখন তা অন্তরে পূর্ণতা লাভ করবে, তখন মহান আল্লাহ ঈমানের প্রতি তার ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। তার অন্তরকে ঈমান দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিবেন এবং কুফরী, পাপ ও অবাধ্যতা, সবই তার নিকট ঘৃণ্য বস্তুতে পরিণত করে দিবেন। আর তাকে হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন।

এটাও তাওহীদের ফযীলতের আওতায় পড়ে যে, তা দুঃখ-কষ্ট বান্দার জন্য অতি সহজ ও আসান করে দেয়। কাজেই বান্দার অন্তর যখন তাওহীদ ও ঈমানে ভরতি হয়, তখন সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ও মেনে নিয়ে প্রশান্ত মনে ও মুক্তচিত্তে যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করে।

তাওহীদের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা বান্দাকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে, তাদের উপর ভরসা করা থেকে, তাদের নিকট আশা রাখা থেকে এবং তাদের জন্যই আমল করা থেকে মুক্তি দান করে। আর

এটাই হলো প্রকৃত ইজ্জত ও সুমহান সম্মান। তাওহীদের মাধ্যমে সে আল্লাহর ইবাদত করার যোগ্য হবে। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আশা করবে না। তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করবে না এবং (সর্ব ক্ষেত্রে) তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এরই মাধ্যমে সুনিশ্চিত হবে তার সাফল্য ও পরিত্রাণ।

এই তাওহীদের যে ফযীলতের সাথে কোনো কিছু মিশ্রিত হয় না, তা হল এই যে, তাওহীদ যখন অন্তরে পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে বাস্তবেই তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তা অল্প আমলকে অধিক করে দেয়। আমলকে সংখ্যাতীত বৃদ্ধি করে দেয়। এই নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য বান্দার (হিসাবের) পাল্লায় এত ভারী হবে যে, আসমান ও যমীনসহ তাতে বসবাসকারী আল্লাহর সকল সৃষ্ট তার মোকাবিলা করতে পারবে না। যেমন, আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপ এক টুকরো কাগজ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস-যাতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকবে-তাকে নব্বইটি এম গোনাহের খাতার সাথে ওজন করা হবে, যা ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যতদূর দৃষ্টি পৌঁছবে। (অথচ কাগজের এই ছোট্ট টুকরোর ওজন ভারী হয়ে যাবে)। আবার এই কালেমার পাঠকদেরই কেউ (এই মর্যাদা) লাভ করবে না। কারণ, সে তাওহীদ ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ হবে না। যেমন এই বান্দা পূর্ণ নিষ্ঠাবান ছিল।

এটাও তাওহীদের ফযীলতের আওতায় পড়ে যে, আল্লাহ তাওহীদ-বাদীদের বিজয় দানের, দুনিয়াতে তাদের সহযোগিতা করার, তাদের ইজ্জত ও সম্মান দানের, তাদের হেদায়াত লাভের, তাদের সমস্যা সমাধানের এবং তাদের যাবতীয় কথা ও কাজকে যথার্থতা দান করার যামীন হয়েছেন।

এটাও তাওহীদের ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত যে, ঈমানদার তাওহীদবাদীদের থেকে মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণ দূরীভূত করেন

এবং মধুর ও শান্তিদায়ক জীবন দান ক’রে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। কুরআন ও হাদীসে এর দৃষ্টান্ত অনেক। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তাওহীদের বাস্তবায়িত করলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لله حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل ١٢٠]

“নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল একটি জাতি (অর্থাৎ, একাই একটি জাতির সমান) আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে শির্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।” (সূরা নাহল ১২০) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُوْنَ ﴾ [المؤمنون: ٥٩]

“আর তারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না।” (সূরা মু’মিনূন ৫৯) হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ، فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ

مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ))، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ))

আমি (কোনো এক বৈঠকে) সাঈদ ইবনে যুবায়ের-رضي الله عنه-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, কাল যে তারাটি কক্ষচ্যুত হয়েছিল, সেটা কে দেখেছে? আমি বললাম, আমি দেখেছি। আমি নামাযে ছিলাম না। কারণ, আমি দংশিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন, তখন তুমি কি করলে? আমি বললাম, আমি তখন ঝাড়-ফুঁক করালাম। তিনি বললেন, এটা তুমি কোন্ ভিত্তিতে করলে? আমি বললাম, শা'বী থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে। তিনি বললেন, তিনি (শা'বী) তোমাদেরকে কি বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে বুরায়দা ইবনে হুসাইব-رضي الله عنه-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন

যে, নজরদোষ, অথবা কোনো কিছুর বিষ ব্যতীত আর কোনো কিছুতে ঝাড়-ফুঁক নেই। তখন তিনি (সাঈদ ইবনে যুবায়ের) বললেন, যে ব্যক্তি তার শোনা হাদীস অনুযায়ী আমল করল, সে অতি উত্তম কাজ করল। তবে আমাদেরকে ইবনে আব্বাস-ﷺ-নবী করীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “প্রত্যেক উম্মতকে আমার নিকট পেশ করা হল। একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম। আর একজন নবীকে দেখলাম, তাঁর সাথে এক-দু’জন লোক ছিল। আর একজন নবীকে দেখলাম, তাঁর সাথে কেউ ছিল না। হঠাৎ এক বিরাট দল দেখলাম। আমি ভাবলাম, এটা হয়তো আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল, এটা মূসা-عليه السلام-ও তাঁর উম্মত। তবে আপনি ওপর দিকে দেখুন। আমি দেখলাম। সেখানেও এক বিরাট দল। আমাকে বলা হল, এটা তোমার উম্মত। এদের মধ্যে ৭০ হাজার এমনও লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাব ও বিনা কোনো শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” অতঃপর নবী করীম-ﷺ-সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরায় চলে গেলেন। লোকেরা উক্ত লোকদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিলেন। কেউ বলেন, ওরা মনে হয় সেই লোক, যারা রাসূ- লুল্লাহ-ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছে। কেউ বলেন, ওরা মনে হয় সেই লোক, যারা ইসলাম নিয়েই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করেনি। আরো বিভিন্ন কথা-বার্তা তাঁরা বালাবলি করছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদেরকে লক্ষ্য ক’রে বললেন, “কি ব্যাপারে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করছ? তাঁরা তাঁকে এ সম্পর্কে জানালেন। তিনি বললেন, “ওরা হল সেই লোক, যারা কারো নিকট ঝাড়-ফুঁক কামনা করে না, অলক্ষণ-কুলক্ষণ বলে কোনো কিছুকে মনে করে

না এবং কারো দ্বারা নিজেদের দেহে দাগ ও চিহ্ন দেওয়ায় না। বরং তারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।” এ (কথা শুনার পর) উক্কাশা ইবনে মেহসান দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুআ করেন, যেন আমিও তাদের একজন হই। তিনি বললেন, “তুমি তাদের একজন।” এরপর অন্য একজন দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্যেও দুআ করে দিন, যেন আমি তাদের একজন হই। তিনি বললেন, “উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।” (বুখারী-মুসলিম)

কতিপয় মসলা জানা গেল

১। তাওহীদে মানুষের শ্রেণীবিভাগ।

২। তাওহীদের বাস্তব রূপদানের অর্থ।

৩। আল্লাহ ইব্রাহীম-ﷺ-এর এই বলে প্রশংসা করেছেন যে, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

৪। আল্লাহ অলীদেরও প্রশংসা ক’র বলেছনে যে, তাঁরা শির্কমুক্ত ছিলেন।

৫। ঝাড়-ফুঁক ও দাগা ত্যাগ করাই হল তাওহীদের বাস্তব রূপ দেওয়া।

৬। যে জিনিস ঐ গুণাবলীর জন্ম দেয়, তারই নাম নির্ভরশীলতা।

৭। সাহাবাগণদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এই মর্যাদা (বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ হওয়া)কেউ আমল ব্যতীত লাভ করবে না।

৮। ভাল কাজের প্রতি সাহাবাদের বড় আগ্রহ ছিল।

৯। এটাও এই উম্মতের ফযীলত যে, সংখ্যায় ও গুণে এরা সর্বাধিক হবে।

১০। মূসা-عليه السلام-এর উম্মতের ফযীলত।

১১। নবী করীম-ﷺ-এর নিকট প্রত্যেক উম্মতকে পেশ করা হয়ে ছিল।

১২। প্রত্যেক উম্মত পৃথক পৃথকভাবে তাদের নবীদের সঙ্গে হাশরের মাঠে

উপস্থিত হবে।

১৩। নবীদের দাওয়াত কবুল করেছে, এমন লোকের সংখ্যা কম হবে।

১৪। যে নবীর দাওয়াত কেউ কবুল করেনি, তিনি হাশরে একা থাকবেন।

১৫। এই জ্ঞানের ফল হল এই যে, সংখ্যায় আধিক্য দেখে প্রতারিত হওয়া এবং সংখ্যায় অল্প দেখে উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

১৬। নজরদোষ এবং দংশণজনিত বিষ দূরীকরণের জন্যে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি আছে।

১৭। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নির্দেশ শুনে সেই মত যে ব্যক্তি আমল করল, সে উত্তম কাজ করল। এই বাক্যের দ্বারা সালাফদের জ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ হয়। আর জানা গেল যে, প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধিতা করে না।

১৮। কারো প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা সালাফদের (পূর্ববর্তী যুগের পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের) রীতি ছিল না।

১৯। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর এই বাণী, 'তুমি তাঁদের একজন' নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন।

২০। (হাদীসে) উক্কাশা-رضي الله عنه-এর ফযীলতের কথা রয়েছে।

২১। (প্রয়োজনে কোনো কথা) প্রত্যক্ষভাবে না বলে পরোক্ষভাবে বলা যায়।

২২। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চারিত্রিক সৌন্দর্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায় হল গত অধ্যায়ের পূরক ও তার অংশ। কারণ, তাওহীদকে বাস্তব রূপ দেওয়ার অর্থ হল, তাকে ছোট ও বড় শির্কের আবর্জনা, বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় এমন কথার বিদআত, আমল থেকে সৃষ্ট কাজের

বিদআত এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ রাখা। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন যাবতীয় কথা ও কাজে এবং ইচ্ছা-ইরাদায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠাবান হবে ও যখন তাওহীদ পরিপন্থী এবং তাওহীদে পূর্ণতা লাভে বাধা দানকারী বড় ও ছোট শির্ক থেকে এবং বিদআত থেকে মুক্ত হবে। অনুরূপ তাওহীদকে দূষিত করে এবং তার সুফল অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সমস্ত পাপাচার থেকে নিরাপদ হবে।

যে ব্যক্তি তাওহীদের বাস্তব রূপ দিবে, অর্থাৎ, তার অন্তর যখন ঈমান, তাওহীদ এবং নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ হবে এবং তার আমল এর সত্যায়ণ করবে, অর্থাৎ, সে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়ে ও তাঁর আনুগত্য ক'রে তাঁর নির্দেশের সামনে নিজেকে নত করে দিবে এবং কোনো পাপের দ্বারা এসবকে কলঙ্কিত করবে না, এই ব্যক্তিই বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সে সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীদের একজন হবে। বিশেষভাবে যে জিনিস তাওহীদের বাস্তব রূপ দেওয়াকে প্রমাণ করে তা হল, সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং আল্লাহর উপর এমন মজবূত আস্থা রাখা যে, অন্তর কোনো ব্যাপারে কোনো সৃষ্টির প্রতি ঝোঁকবে না। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদের নিকট কোনো কিছু কামনা করবে না। বরং তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, যাবতীয় কথা ও কাজ, তার ভালবাসা ও বিদ্বেষ এবং তার সব কিছুর দ্বারা আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ। কেবল কামনা এবং মিথ্যা দাবী করলেই তাওহীদের বাস্তবরূপ দেওয়া হয় না, বরং তা হয় ঈমান ও নিষ্ঠাকে অন্তরে স্থান দিয়ে, আর এর সত্যায়ণ করবে উত্তম চরিত্র ও নেক আমল। এইভাবে যে তাওহীদের বাস্তব রূপ দিবে, সেই-ই গত অধ্যায়ে উল্লিখিত সমস্ত ফযীলত পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

শির্ককে থেকে বিরত থাকা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" (সূরা নিসা ৪৮) ইব্রাহীম-عليه السلام-দুআ ক'রে বলেছিলেন,

﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصنَامَ ﴾ [ابراهيم: ٣٥]

"হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা হতে দূরে রাখ।" (সূরা ইব্রাহীম ৩৫) আর হাদীসে এসেছে (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,)

((أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ)) فَسُئِلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: ((الرياء))

"আমি তোমাদের উপর সর্বাধিক যে জিনিসের আশঙ্কা বোধ করি, তা হল ছোট শির্ক। আর ছোট শির্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "তা হল রিয়া" (লোক দেখানী কোনো কাজ করা।" আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ لله نِدًا دَخَلَ النَّارِ)) [البخارى]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী) মুসলিম শরীফে জাবির-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ)) [البخاري]

"যে ব্যক্তি শির্ক মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শির্ক নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। শির্ককে ভয় করা।

২। 'রিয়া' (লোক দেখানী কাজ) শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৩। তবে এটা ছোট শির্ক।

৪। নেক লোকদের জন্য এটাই (ছোট শির্ক) হল সর্বাধিক ভীতিপ্রদ শির্ক।

৫। জান্নাত ও জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়া।

৬। জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়েরই নিকটে হওয়ার কথা একটি হাদীসে এসেছে।

৭। যে ব্যক্তি শির্কমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শির্ক নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যদিও সে মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী ইবাদতকারী হয়।

৮। বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইব্রাহীম-عليه السلام-এর আল্লাহর নিকট মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করা।

৯। তাদের অধিকাংশের অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "হে আমার প্রতিপালক! এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে।"

১০। এতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ব্যাখ্যা রয়েছে, যেমন ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন।

১১। শির্ক থেকে মুক্ত ব্যক্তির ফযীলত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহর উপাস্যে এবং তাঁর ইবাদতে শরীক করা, তাওহীদের ঘোর বিরোধী। আর তা দুই প্রকারের, (১) বড় তথা স্পষ্ট শির্ক। (২) ছোট তথা সূক্ষ্ম শির্ক। বড় শির্ক হল, আল্লাহর কোনো শরীক নিযুক্ত ক'রে তাকে আল্লাহর মত আহ্বান করা, অথবা ভয় করা, কিংবা তার নিকট আশা করা, বা আল্লাহর মত তাকে ভালবাসা, কিংবা ইবাদতের কোনো কিছু তার জন্য সম্পাদন করা। এই শির্ক যে করবে, সে সম্পূর্ণ তাওহীদ শূন্য হবে। আর এই মুশরিকের জন্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। ওর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যে ইবাদত গায়রুল্লাহর জন্য সম্পাদন করা হয়েছে, তার নাম ইবাদত রাখা হোক কিংবা অসীলা রাখা হোক, অথবা অন্য যে কোনো নামেই তার নামকরণ করা হোক না কেন, সবই বড় শির্ক গণ্য হবে। কারণ, জিনিসের অর্থ ও তার মূল বিষয়ই লক্ষণীয়। শাব্দিক পার্থক্য লক্ষণীয় নয়। আর ছোট শির্ক হল, এমন সমস্ত কথা ও কাজ, যার দ্বারা বড় শির্ক পর্যন্ত পৌঁছা হয়। যেমন, কোনো সৃষ্টির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক'রে তাকে ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া, অথচ সে এর যোগ্য নয় এবং গায়রু-ল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ ও লোক দেখানী কোনো কাজ করা ইত্যাদি।

শির্ক যখন তাওহীদ পরিপন্থী, যা জাহান্নামে প্রবেশ এবং সেখানে চিরন্তন অবস্থানকে ওয়াজিব করে, আর তা বড় হলে, জান্নাত হারাম করে এবং তা থেকে মুক্ত না থাকা পর্যন্ত সৌভাগ্য লাভের কোনো উপায়ই থাকে না, তখন প্রত্যেক বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য হল, শির্ককে দারুণভাবে ভয় করা। তা থেকে এবং তার সমস্ত পথ ও উপায়-উপকরণ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা। আর আম্বিয়া, পূণ্যবান এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ লোকদের

মত তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করা। আর বান্দার উচিত অন্তরে মজবূত নিষ্ঠার স্থান দেওয়া। আর এটা হবে আল্লাহর সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে এবং তাঁকেই একমাত্র উপাস্য বলে মেনে নিয়ে। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে। তাঁকেই ভয় করে। তাঁরই নিকট কামনা ও আশা করে। বান্দা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যা কিছু করবে ও যা ত্যাগ করবে, এসবের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর সাওয়াব লাভ। কারণ, ইখলাসের গুণই হল যে, তা ছোট ও বড় শির্ককে দূর করে। আর দুর্বল ইখলাসের কারণেই মানুষ শির্কে পতিত হয়।

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য প্রদানের আহ্বান

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

﴿ قُل هَذِهِ سَبِيلي أَدْعُو الى اللهِ عَلى بَصيرَةٍ ﴾ [يوسف ١٠٨]

“বলে দাও, এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি জ্ঞানের আলোকে।” (ইউসুফ ১০৮) ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন মুআ’য-ﷺ-কে ইয়ামান অভিমুখে পাঠিয়ে ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,

إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)) وَفِيْ رَوَايَةٍ: ((اِلَى أَن يُّوَحِّدُوا اللهَ)) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ

دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)) [اخرجاه]

"তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছ, যারা আহলে কিতাব। অতএব সর্ব প্রথম যে জিনিসের দিকে তাদেরকে আহ্বান করবে, তা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তারা যেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে নেয়। যখন তারা এটা মেনে নিবে, তখন তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যখন তারা এটা মেনে নিবে, তখন তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের বিত্তশালীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে এবং গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যখন তারা এ ব্যাপারে তোমার কথা মেনে নিবে, তখন তাদের উত্তম মাল থেকে সাবধান থাকবে এবং মযলুমের বদ্দুআকে ভয় করবে। কারণ, এই তার (বদ্দুআর) ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল নেই।" (বুখারী-মুসলিম) বুখারী-মুসলিমেই সাহল ইবনে সাআ'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-খায়বারের দিন বলেছিলেন,

((لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّه اللهُ وَرَسُوْلُهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ-ﷺ-كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأْتُونِي بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ:انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ

بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ))

"অবশ্যই আমি কাল এমন লোকের হাতে ঝাণ্ডা দিব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও ভালবাসেন। আল্লাহ তাঁরই হাতে বিজয় দান করবেন। লোকেরা এই ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে রাত্রি যাপন করল যে, তাদের মধ্যে কাকে এই ঝাণ্ডা দেওয়া হবে। প্রভাত হলে সকলেই এই আশা নিয়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হল যে, তাকে এই ঝাণ্ডা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-জিজ্ঞাসা করলেন, আলী ইবনে আবী তালেব কোথায়? বলা হল, তিনি চক্ষু পীড়ায় ভুগছেন। অতঃপর লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন, তিনি এমন-ভাবে পীড়ামুক্ত হলেন যে, তাঁর কোনো ব্যথাই যেন ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে ঝাণ্ডা দিয়ে বললেন, তুমি তাদের দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে যাও এবং তাদের প্রাঙ্গণে পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর ও তাদের উপর আল্লাহ তাআলার অপরিহার্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত কর। আল্লাহর শপথ! যদি একটি মানুষও তোমার মাধ্যমে সুপথ পায়, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের থেকেও উত্তম হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

যে বিষয়গুলি জানা গেল,

১। আল্লাহর প্রতি আহ্বান করা তারই রীতি, যে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অনুসরণ করেছে।

২। ইখলাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ, অনেকেই হক্কের দিকে আহ্বান করলেও তাদের উদ্দেশ্য হয় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি।

৩। জ্ঞানের আলোকে দাওয়াত দেওয়া অপরিহার্য।

৪। সব থেকে সুন্দর তাওহীদের প্রমাণ হল, আল্লাহকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত মনে করা।

৫। সব থেকে নিকৃষ্ট শির্ক হল, আল্লাহকে দোষযুক্ত মনে করা।

৬। এটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হল, মুসলিমকে মুশরিকদের থেকে দূরে রাখা, যাতে সে শির্ক না করা সত্ত্বেও তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়।

৭। তাওহীদই হলো প্রথম ওয়াজিব।

৮। সবকিছুর আগে তাওহীদ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে, এমন কি নামাযেরও আগে।

৯। আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করার অর্থ হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মা'বূদ নেই।

১০। মানুষের মধ্যে অনেকে আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও শাহাদত কি বুঝে না। আবার কেউ বুঝলেও তদনুযায়ী আমল করে না।

১১। পর্যায়ক্রমভাবে শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব।

১২। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান আগে শুরু করা।

১৩। যাকাতের অধিকারী কে?

১৪। শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণ।

১৫। উত্তম মাল নেওয়া থেকে নিষেধ প্রদান।

১৬। মযলুমের বদ্দুআ থেকে বাঁচা।

১৭। মযলুমের বদ্দুআ যে বৃথা যায় না সে ব্যাপারে অবহিত করণ।

১৮। নবী সম্রাট এবং বড় বড় অলীদের উপর যে সংকট, ক্ষুধার তাড়না এবং বিপদাপদ বয়ে গেছে, তাও তাওহীদের দলীলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১৯। ‘কাল আমি অবশ্যই ঝাণ্ডা দিব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে---এটা নবূওয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন।

২০। আলী-ﷺ-এর চক্ষুদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর থুথু লাগিয়ে দেওয়াও নবূওয়াতের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন।

২১। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফযীলত।

২২। বিজয়ের সুসংবাদ শুনে সেই রাতে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং ব্যস্ততায় মধ্যে থাকার ফযীলত।

২৩। ভাগ্যের উপর ঈমান আনা। কখনো এমন ব্যক্তি (বিশেষ কোনো) সম্মান লাভে ধন্য হয়, যে তার জন্য কোনো চেষ্টাই করে না। আবার কেউ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা পায় না।

২৪। ‘ধীরপদক্ষেপে এগিয়ে যাও’ এর দ্বারা আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

২৫। যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।

২৬। ইসলামের দাওয়াত তাদের জন্যও জায়েয, যাদেরকে পূর্বে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং যাদের সাথে যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে।

২৭। কৌশলের সাথে দাওয়াত দেওয়া। কারণ, বলা হয়েছে, ‘তাদেরকে তাদের উপর ওয়াজিব জিনিস সম্পর্কে জানাবে।

২৮। ইসলামে আল্লাহর অধিকার কি তা জানা।

২৯। যার হাতে একজন মানুষও সুপথ পাবে, সে অনেক সাওয়াব লাভে ধন্য হয়, এ কথাও বর্ণিত হয়েছে।

৩০। ফাতাওয়া দেওয়া প্রসঙ্গে শপথ গ্রহণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

লেখকের এই অধ্যায়কে এখানে আনা খুবই উপযুক্ত হয়েছে। কারণ, বিগত অধ্যায়গুলোতে তাওহীদের আবশ্যকতা, তার ফযীলত, তার পূর্ণতা

লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান, তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপ দান এবং তার বিপরীত জিনিসকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। আর এরই মাধ্যমে যে বান্দা পূর্ণতা লাভ করতে পারে, সে কথাও বলা হয়েছে। অতঃপর এই অধ্যায়কে উক্ত অধ্যায়গুলোর পূরক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর তা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমে। কারণ, তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ বান্দা তার সমস্ত দিকে পূর্ণতা লাভ করে অন্যের জন্যও চেষ্টা না করবে। আর এটাই ছিলো সমস্ত নবীদের তরীকা। কারণ, তাঁরা সর্ব প্রথম যে জিনিসটির প্রতি তাঁদের জাতিকে আহ্বান করেছিলেন, তা ছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোনো শরীক নেই। আর এটাই ছিল নবী সম্রাট ও সকল নবীদের ইমাম মুহাম্মাদ-ﷺ-এর তরীকা। কেননা, তিনি এই দাওয়াত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করেছিলেন কৌশল, উত্তম নসীহত এবং সুন্দর বিতর্কের মাধ্যমে। তাঁর অব্যাহত দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর দ্বারা বিশাল সৃষ্টিকে হেদায়াত দান করেন। তাঁর দাওয়াতের বরকতে দ্বীন পূর্ব ও পশ্চিমের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি নিজেও তাঁর অনুসারীদের বলতেন, সমস্ত কিছুর পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদের দিকে ডাক দিবে। কারণ, যাবতীয় আমল সঠিক হওয়া এবং তা কবুল হওয়া নির্ভর করে তাওহীদের উপর।

আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করা যেমন বান্দার উচিত, তেমনি উত্তম পন্থায় অন্যদেরকেও এর প্রতি আহ্বান জানানো তার কর্তব্য। কারণ, যারই মাধ্যমে কেউ সুপথ পাবে, সেও হেদায়াত লাভকারীদের মত নেকী পাবে। তবে হেদায়াত লাভকারীদের নেকী থেকে কোনো কিছু কম করা

হবে না। আল্লাহ ও ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান করা যখন প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য, তখন প্রত্যেকের উচিত সাধ্যানু-সারে তা পালন করা। তবে বক্তৃতার মাধ্যমে এর প্রতি দাওয়াত দেওয়া অন্যদের থেকে আলেমদের দায়িত্ব বেশী। অনুরূপ যারা শারীরিক মেহনত দানে সমর্থবান অথবা যারা মাল ও কথার দ্বারা দাওয়াতী কাজ করতে সক্ষম, তাদের দায়িত্ব ওদের থেকে বেশী, যারা এসবের সামর্থ রাখে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن ١٦]

“আল্লাহকে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুসারে ভয় কর।”

তার প্রতি আল্লাহ রহম করুন! যে দ্বীনের সহযোগিতা করে, সমান্য বাক্য দিয়ে হলেও। আর ধ্বংস তখনই নেমে আসে, যখন সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দ্বীনের দাওয়াতের কাজ ত্যাগ করা হয়।

তাওহীদ ও ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾

[الاسراء:٥٧]

“তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে।” তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ

سَيَهْدِينِ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف ٢٦-٢٨]

"যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন। এ কথাটিকে তিনি অক্ষয় বাণীরূপে তাঁর সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছেন, যাতে তারা আল্লাহর দিকেই আকৃষ্ট থাকে।" (সূরা যুখরুফ ২৬-২৮) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ [التوبة:٣١]

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ধর্মীয় নেতা ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবা ৩১) তিনি আরো বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ﴾ [البقرة ١٦٥]

"আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে।" (সূরা বাক্বারা ১৬৫) সহীহ হাদীসে নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করল এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল মা'বূদকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম। আর তার হিসাব

মহিমময় আল্লাহর উপর ন্যস্ত।” (মুসলিম)

এই অধ্যায় এবং এর পরবর্তী অধ্যায়গুলোর ব্যাখ্যায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা রয়েছে। আর তাই সেটাই তাওহীদ ও শাহাদাতের ব্যাখ্যা। কয়েকটি স্পষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তার সূরা ইসরার আয়াত, যাতে সেই মুশরিকদের বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য নেক লোকদের আহ্বান করে থাকে। এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, এটাই বড় শির্ক। আর তার মধ্যে রয়েছে সূরা বারাআতের আয়াত, যাতে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে নিজেদের পালনকর্তা-রূপে গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে তো কেবলমাত্র এক আল্লাহরই ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অথচ আয়াতের জড়তাহীন ব্যাখ্যা হল, তারা পাপের কাজে আলেম ও কোনো খাস বান্দার আনুগত্য করত, কিন্তু বিপদের সময় তাদেরকে আহ্বান করত না। আর এরই মধ্যে হল ইব্রাহীম-ﷺ-এর কাফেরদের ব্যাপারে এই বাণী,

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾

“যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক কেবল তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা যুখরুফ ২৬-২৭) সমস্ত বাতিল মা'বূদকে অস্বীকার ক'রে আল্লাহকেই মা'বূদ বলে মেনে নিয়েছেন, যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। আর মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, এই সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা করাই হল, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা। তাই তিনি বললেন,

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

"এ ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে তার পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছে; যাতে ওরা (সৎপথে) প্রত্যাবর্তন করে।" (সূরা যুখরুফ ২৮) আর এরই মধ্যে হল কাফেরদের ব্যাপারে সূরা বাক্বারায় উল্লিখিত কথা, যাতে বলা হয়েছে, 'তারা কোনো দিন জাহান্নাম থেকে বের হবে না।' উল্লিখিত হয়েছে যে, তারা তাদের শরীকদেরকে আল্লাহর মত করে ভালবাসত। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হল যে, তারা আল্লাহকেও অত্যধিক ভালবাসত। কিন্তু এই ভালবাসা তাদেরকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। তাহলে সে কেমনে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যে শরীককে আল্লাহর থেকে বেশী ভালবাসে। আর সে-ই বা কি করে মুসলিম বিবেচিত হতে পারে, যে কেবল শরীককে ভালবাসে, আল্লাহকে বাসে না? আর এরই পর্যায়-ভুক্ত হল রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণী,

((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করল এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল মা'বূদকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম। আর তার হিসাব মহিমময় আল্লাহর উপর ন্যস্ত।" এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যাতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। কারণ, শুধু তার মৌখিক স্বীকৃতিই জান ও সম্পদের হিফাযতের জন্য যথেষ্ট বলা হয়নি। বরং এটাও বলা হয়নি যে, মৌখিক স্বীকৃতির সাথে তার অর্থ জানলেই ও তা স্বীকার করলেই হবে। আর এটাও না যে, সে

কেবল আল্লাহকেই আহ্বান করে, যার কোনো শরীক নেই, বরং তার জান ও মালের হিফাযতের যামানত ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহকে স্বীকার করার সাথে সাথে অন্যান্য মা'বূদকে অস্বীকার করবে। এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করলে হবে না। কত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ এই ব্যাপারটা! কত পরিষ্কার করে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং কত বলিষ্ঠ দলীল দ্বারা তর্ককারীদের কথার খণ্ডন করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তাওহীদের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহকে যাবতীয় পূর্ণ গুণে এক ও একক বলে স্বীকার করা, এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখা এবং সমস্ত ইবাদতকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করা। আর এটা হয় দু'টি জিনিসের মাধ্যমে। তা হল,

১। আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ, এই জ্ঞান রাখা ও বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সৃষ্টির কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। না কোনো প্রেরিত নবী, আর না কোনো নিকটতর ফেরেশতা, আর না অন্য কেউ। সৃষ্টির কারো এতে কোনো প্রকারের অংশ নেই।

২। এক ও এককভাবে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাকে কেবল মহান আল্লাহর জন্যই প্রতিষ্ঠিত করা, যার কোনো শরীক নেই। পূর্ণ গুণের অধিকারী কেবল তাঁকেই মনে করা। আর শুধুমাত্র এই বিশ্বাসই বান্দার জন্য যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ক'রে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের দাবী পূরণ করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নিকট নেকী পাওয়ার আশা নিয়ে তাঁর ও বান্দার অধিকারসমূহকে আদায় করবে। জেনে রাখা উচিত যে, কালেমা শাহাদাতের প্রকৃত অর্থ হল,

গায়রুল্লাহর ইবাদত থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা করা। কিন্তু যদি শরীক বানিয়ে তাকেও আল্লাহর মত করে ভালবাসে অথবা আল্লাহর ন্যায় তারও আনুগত্য করে, কিংবা যদি তারও জন্য ঐ রূপ আমল করে, যেমন আল্লাহর জন্য করে, তাহলে তা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কঠোর বিরোধী হবে। লেখক-আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন!-পরিষ্কার করে এ কথার উল্লেখ করেছেন যে, সব থেকে বেশী পরিষ্কার করে যে জিনিসটি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ব্যাখ্যা করে দেয়, তা হলো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর (নিম্নের) বাণী,

((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করল এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল মা'বূদকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম। আর তার হিসাব মহিমময় আল্লাহর উপর ন্যস্ত।" (মুসলিম) কারণ, শুধু তার মৌখিক স্বীকৃতিকে জান ও সম্পদের হিফাযতের জন্য যথেষ্ট বলা হয়নি। বরং এটাও বলা হয়নি যে, মৌখিক স্বীকৃতির সাথে তার অর্থ জানলেই ও তা স্বীকার করলেই হবে। আর এটাও না যে, তার কেবল আল্লাহকেই আহ্বান করলেই হবে, যার কোনো শরীক নেই, বরং তার জান ও মালের হিফাযতের যামানত ততক্ষণ পর্যন্ত দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহকে স্বীকার করার সাথে সাথে অন্যান্য মা'বূদকে অস্বীকার করবে। আর এ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করলে চলবে না। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কেবল আল্লাহরই এবাদত ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে এবং এই বিশ্বাসের সাথে সাথে মৌখিক এর স্বীকৃতিও

দিতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর অনুসরণ ক'রে কেবল তাঁরই উপাসনা করতে হবে এবং কাজের ও কথার মাধ্যমে এর পরিপন্থী বিষয় থেকে মুক্ত ঘোষণা দিতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তাওহী-দবাদীদের ভালবাসবে এবং তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে ও তাঁদের সহযোগিতা করবে। আর কাফের ও মুশরিকদের সাথে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করবে। এখানে মুখের কথা ও মিথ্যা দাবী কোনো কাজে আসবে না। বরং জ্ঞান, বিশ্বাস এবং কথা ও কাজের একে অপরের সাথে মিল থাকতে হবে। কারণ, এ জিনিসগুলো পরস্পর থেকে অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোর একটি বাদ দিলে, সবই বাদ পড়বে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার জন্য অথবা তা দূরীকরণের জন্য সুতা ও গোলাকার কোনো কিছু ব্যবহার করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ﴾ [الزمر:٣٨]

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে?" (সূরা যুমার ৩৮)

((عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: ((مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ؟)) قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا)) [رواه أحمد]

ইমরান ইবনে হুসাইন-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এক ব্যক্তির হাতে পিতলের গোলাকার একটি জিনিস দেখে বললেন, "এটা কি?" সে বলল, ব্যাধির জন্য এটা ব্যবহার করেছি। তিনি বললেন, "এটা খুলে ফেলে দাও। কারণ, এতে তোমার ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে, কমবে না। আর তুমি যদি এই জিনিসটা নিয়েই মৃত্যু বরণ কর, তাহলে কখনোই মুক্তি পাবে না।" (ইমাম আহমদ দোষমুক্ত সনদে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন)। ইমাম আহমদ (রাহঃ) উক্কবা ইবনে আমের থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ)) وفي رواية: ((مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)) [رواه أحمد]

"যে তাবীজ ব্যবহার করল, আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করে। আর যে ব্যক্তি ঘুঙ্গুর ঝুলাল, আল্লাহ যেন তাকে রক্ষা না করে।" অন্য আর এক বর্ণনায় এসেছে, "যে তাবীয ঝুলালো করল, সে শির্ক করল।" আবূ হাতেমের পুত্র হুযাইফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক ব্যক্তির হাতে জ্বরের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এমন সূতা দেখলে, তা কেটে ফেলেন এবং আল্লাহর এই বাণী পাঠ করেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف:١٠٦]

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শির্কও করে।" (সূরা ইউসুফ ১০৬)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। গোলাকার কোনো জিনিস ও সূতা প্রভৃতি ব্যবহারের ব্যাপারে কঠোর-

ভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২। যদি সাহাবীর এরই উপর মৃত্যু হত, তাহলে তিনি মুক্তি পেতেন না। এটা সহাবাগণের এই মন্তব্যের সাক্ষ্য হয়ে যায় যে, ছোট শির্ক কাবীরা গোনাহের থেকেও মারাত্মক।

৩। অজ্ঞতার ওযর-আপত্তি গ্রহণীয় নয়।

৪। বালা ও সূতা পরিধানে ব্যাধির কোনো উপশম ঘটবে না, বরং এতে ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে।

৫। কঠোরভাবে তার প্রতিবাদ, যে এ রকম করে।

৬। এ কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল করা দেওয়া হবে।

৭। এ কথাও পরিষ্কার যে, যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করল, সে শির্ক করল।

৮। জ্বরের জন্য সূতা বাঁধাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৯। হুযাইফা-رضي الله عنه-এর আয়াত পাঠ এ কথা প্রমাণ করে যে, সাহাবাগণ বড় শির্কের আয়াতকে ছোট শির্কের উপর দলীল সাব্যস্ত করতেন। যেমন ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-সূরা বাক্বারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

১০। নজরদোষ থেকে বাঁচার জন্য ঘুঙ্গুর ব্যবহার করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

১১। যে তাবীয ব্যবহার করে, তার জন্য এই বলে বদ্দুআ করা, আল্লাহ যেন তার মনোবাসনা পূরণ না করেন। আর যে ঘুঙ্গুর ব্যবহার করে, আল্লাহ যেন তাকে রক্ষা না করেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়কে তখনই বুঝতে পারবে, যখন উপায়-উপকরণের বিধান সম্পর্কে জানবে। অথাৎ, উপকরণ ও মাধ্যমের ব্যাপারে তিনটি বিষয় জানা প্রত্যেক বান্দার উপর ওয়াজিব। (আর তা হল,)

১। সেই জিনিসকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করবে, যার মাধ্যম হওয়ার কথা শরীয়ত কর্তৃক সাব্যস্ত।
২। মাধ্যমের উপরেই ভরসা করবে না। বরং শরীয়ত সমর্থিত মাধ্যম গ্রহণ করে যিনি মাধ্যম বানিয়েছেন ও নির্ধারিত করেছেন, তাঁরই উপর ভারসা করবে এবং উপকারী মাধ্যম গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে।
৩। এই মাধ্যমগুলো যতই বড় ও বলিষ্ঠ হোক না কেন, সবই আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর ক্ষমতাধীন। আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। মহান আল্লাহ যেভাবে চান এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ তাঁর হিকমতের দাবী অনুপাতে যদি চান মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা বাকী রাখেন, যাতে বান্দারা তা অবলম্বন করে আল্লাহর পূর্ণ হিকমত সম্পর্কে অবহিত হয়। আবার যদি চান মাধ্যম হওয়ার যোগ্যতা বাকী রাখেন না। যাতে বান্দারা যেন তার উপর ভরসা না করে এবং তারা যেন আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়। তারা জেনে নেয় যে, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং যা ইচ্ছা তা-ই করার ইখতিয়ার কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। মাধ্যম-গুলোর ব্যাপারে এই ধরনের ধারণা রাখাই হল বান্দার উপর ওয়াজিব। এই অবগতির পর যে ব্যক্তি বালা অথবা সূতা বা এই ধরনের কোনো জিনিস আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য, অথবা আগত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবহার করবে, সে মুশরিক বিবেচিত হবে। কারণ, তার এই বিশ্বাস যদি হয় যে, তাই রক্ষাকারী, তাহলে তা বড় শির্ক গণ্য হবে। আর এটা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্ক করা হবে। কারণ, সে এই বিশ্বাস রাখল যে, সৃষ্টি করা ও ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর কেউ শরীক আছে। আবার এটা তাঁর ইবাদতেও শির্ক হবে। কারণ, তার অন্তর লাভের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় অন্যের সাথে জড়িত। আর সে

যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহই রক্ষাকারী, কিন্তু সে এই জিনিসগুলো মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে, তাহলে সে এমন জিনিসকে মাধ্যম বানাবে, যা শরীয়ত কর্তৃকও মাধ্যম বলে উল্লেখ হয়নি এবং বাস্তবের আলোকেও তা মাধ্যম নয়। বরং এটা হারাম এবং শরীয়ত ও বাস্তবতার উপর মিথ্যা আরোপ। শরীয়তী মাধ্যম এটা নয়, কারণ শরীয়ত এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ দান করেছে। আর যা থেকে শরীয়ত নিষেধ দান করে, তা ফলপ্রসূ মাধ্যম হতে পারে না। বাস্তবতার আলোকেও এটা মাধ্যম নয়, কারণ, এতে কোনো উদ্দেশ্য সাধন হয় বলে জানা যায়নি। আর এটা বৈধ ফলপ্রসূ কোনো ঔষধ নয়। অনুরূপ এটা শির্কের মাধ্যম-সমূহের অন্যতম। কারণ, যে এসব ব্যবহার করে, তার অন্তর এর সাথে জড়িয়ে থাকে। আর এই (জড়িয়ে থাকা) এক প্রকার শির্ক ও তার মাধ্যম।

এই জিনিসগুলো যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কর্তৃক প্রমাণিত শরীয়ত সম্মত মধ্যম নয়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নেকীর আশায় অবলম্বন করা যায় এবং বাস্তবতার আলোকেও তার কোনো উপকার জানা যায়নি, যেমন বৈধ ঔষধ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়, তখন তা ত্যাগ করা মু'মিনের জন্য জরুরী। যাতে তার ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়। কেননা, তাওহীদ পরিপূর্ণ থাকলে, অন্তর তার পরিপন্থী বিষয়ের সাথে জুড়বে না। ক্ষতি ব্যতীত কোনো প্রকারের উপকার যাতে নাই, তা ব্যবহার করা অজ্ঞতারই পরিচয় হবে। শরীয়তের মূল লক্ষ্য হল, মানুষকে মূর্তিপূজা ও সৃষ্টির উপর ভরসা করা থেকে মুক্ত ক'রে তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা এবং কুসংস্কার ও মিথ্যা জিনিস থেকে মুক্ত ক'রে এমন জিনিসের প্রচেষ্টায় লাগানো, যা জ্ঞানের জন্য উপকারী হবে, নাফসকে পবিত্র করবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ের জন্য সংশোধনকারী হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গে

((في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﷺ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ)) [رواه البخاري ومسلم]

সহী হাদীসে আবূ বাশীর আনসারী-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, তিনি কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁকে এই মর্মে পাঠালেন যে, কোনো উটের গর্দানে ধনুকের অথবা অন্য কোনো কিছুর হার যেন না থাকে। থাকলে তা যেন ঝিঁড়ে ফেলা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)) [رواه أحمد وأبوداود]

"নিশ্চয় ঝাড়-ফুঁক, তাবীয ব্যবহার এবং যাদু-বিদ্যা শির্ক।" (আহমদ ও আবূ দাউদ) আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ)) [رواه أحمد والترمذي]

"যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হবে।" 'তামীমাহ' এমন জিনিস, যা নজরদোষ থেকে বাঁচার জন্য শিশুদের গলায় (বা শরীরের কোনো স্থানে) ঝুলানো হয়। তবে যা ঝুলানো হয়, তা যদি কুরআন থেকে হয়, তাহলে সালফে সালেহীনদের কেউ কেউ অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ তার অনুমতি দেননি। বরং

তা নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যেই গণ্য করেছেন। ইবনে মাসউদ-ﷺ-হলেন এদের অন্যতম।

‘আররুক্বা’ বা ঝাড়-ফুঁক। এর অপর নাম ‘আযায়েম’। শির্কমুক্ত ঝাড়-ফুঁক প্রমাণাদির ভিত্তিতে সাধারণ ঝাড়-ফুঁকের ব্যতিক্রম। কেননা, রাসূ-লুল্লাহ-ﷺ-নজরদোষ ও বিষাক্ত প্রাণির দংশনে তার অনুমতি দিয়েছেন। আর ‘তিওয়ালাহ’ হল এমন জিনিস, যার আশ্রয় মানুষ এই ধারণা নিয়ে গ্রহণ করে যে, এর দ্বারা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেম সৃষ্টি হওয়াতে প্রভাব ফেলে। ইমাম আহমদ রুআইফা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ))

“হে রুআইফা, হতে পারে তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে, তাই লোক-দেরকে এই খবর জানিয়ে দিবে যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দিবে অথবা কোনো ঘন্ট ঝুলাবে কিংবা জানোয়ারের গবর, বা হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করবে, মুহাম্মাদ-ﷺ-তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা করছেন।” সাঈদ ইবনে যুবায়ের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ)) [رواه وكيع]

“যে ব্যক্তি কোনো মানুষের তাবীয ঝিঁড়ে ফেলে, সে একজন ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী পায়।” আর ইব্রাহীম (রাহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাফগণ যাবতীয় তাবীয অপছন্দ করতেন, তাতে তা কুরআন থেকে হোক, বা অন্য কিছু থেকে।

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। 'আররুক্কা' এবং 'তামায়েম'-এর ব্যাখ্যা।

২। 'তেওয়ালা'র ব্যাখ্যা।

৩। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই এ তিনটি শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৪। নজরদোষে ও কোনো বিষাক্ত প্রাণির দংশনে সত্য বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা শির্কের আওতায় পড়ে না।

৫। তাবীয যদি কুরআন থেকে হয়, তাহলে তা জায়েয হবে কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৬। বদনজর থেকে বাঁচার জন্য জানোয়ারের গলায় ঘন্ট ইত্যাদি ঝুলানো শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৭। তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, যে ধনুক ঝুলাবে।

৮। তার ফযীলতের কথা, যে কোনো মানুষের তাবীয ছিঁড়ে ফেলে।

৯। ইব্রাহীম (রাহঃ) এর মন্তব্য উল্লিখিত মতভেদের বিপরীত নয়। কেননা, তাঁর উদ্দেশ্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-এর সহচরবৃন্দ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তাবীয ব্যবহার করা, বালা ও সূতা ব্যবহার করার মতনই, যার কথা আগে বলা হয়েছে। কোনো কোনো তাবীয তো বড় শির্কের আওতায় পড়ে। যেমন, শয়তান অথবা কোনো সৃষ্টির সাহায্য কামনা করা হয়েছে এই ধরনের তাবীয। কারণ, গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া, যে সাহায্যের সে শক্তি রাখে না, বড় শির্ক গণ্য হয়। আগত অধ্যায়ে এর বয়ান আসবে ইনশা---। আবার কোনো কোনো তাবীয হারাম। যেমন, এমন সব নাম বিশিষ্ট তাবীয, যার অর্থ বোধগম্য নয়। এই তাবীয শির্ক পর্যন্ত নিয়ে

যায়। তবে যা ঝুলানো হয়, তা যদি কুরআন অথবা হাদীস কিংবা কোনো দুআ হয়, তাহলে তাও ত্যাগ করাই উত্তম। কেননা, প্রথমতঃ শরীয়তে এর উল্লেখ হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এটা অন্যান্য হারাম জিনিস ব্যবহারের মাধ্যম হয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ যে ঝুলায়, সে এর সম্মান দেয় না। এই তাবীয নিয়ে নোংরা স্থানেও সে প্রবেশ করে। তবে ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে ব্যাখ্যা এসেছে। আর তা হল, যদি তা কুরআন অথবা সুন্নাত কিংবা ভাল বাক্য দ্বারা হয়, তাহলে যে ঝাড়-ফুঁক করে দেয়, তার জন্য তা জায়েয। কেননা, তা অনুগ্রহের আওতায় পড়ে এবং তাতে উপকারও রয়েছে। আর এটা তার জন্যও বৈধ, যাকে ঝাড়া হয়। তবে উচিত প্রথমেই কারো নিকট ঝেড়ে দেওয়া কামনা না করা। কারণ, বান্দার (আল্লাহর উপর) পূর্ণ ভরসা এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয় দাবী হল, সৃষ্টির কারো কাছে ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি তলব না করা। তবে যদি ঝাড়ে গায়রুল্লাহকে আহ্বান করা হয় এবং গায়রুল্লাহর নিকট আরোগ্য কামনা করা হয়, তাহলে তা বড় শির্ক বলে গণ্য হবে। কারণ, এটা হল গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা এবং তার কাছে ফরিয়াদ করা। এই ব্যাখ্যাটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। যেহেতু ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যম ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকারের, তাই শুধু এক রকম বিচার করলে হবে না। (বরং এ ব্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾ [النجم:١٩-٢٠]

“তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্বন্ধে? এবং তৃতীয় আর একটি মানাত সম্বন্ধে?” (সূরা নাজম ১৯-২০)

عن أبي واقد الليثي قال: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُوْنَ عِنْدَهَا وَ يَنُوْطُوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اللهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً)) [رواه الترمذي]

“আবূ ওয়াক্বিদ আল-লায়সী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম-ﷺ-এর সাথে হুনাইন অভিমূখে রওনা হই। আমরা তখন নবাগত মুসলিম ছিলাম। মুশরিকদের একটি কুলের (বরই) গাছ ছিল। সেখানে তারা বসতো এবং তাতে তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। এই গাছটিকে ‘যাতু আনওয়াত’ বলা হত। আমরাও একটি কুলের গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺকে বললাম, ওদের মত করে আমাদের জন্যও একটি ‘যাতু আনওয়াত’ নির্দিষ্ট করে দিন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, ‘আল্লাহু আকবার’ এটা তো (ভ্রান্ত জাতির) রীতি-নীতি। সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জান, এটা ঐ ধরনের কথা, যা বানী ইস্রাঈলরা মূসা-ﷺ-কে বলেছিল। তারা বলেছিল, ‘হে মূসা! ওদের যেমন বহু দেবতা রয়েছে, তেমনি আমাদের জন্যও একটি দেবতা বানিয়ে দিন। সে বলল, তোমরা তো এক মূর্খ জাতি।’ তোমরা পূর্বেকার (বিভ্রান্ত জাতির) রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।” (তিরমিযী)

যে বিষয়গুলো জানা গেল

১। সূরা নাজমের আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। তাদের চাওয়া জিনিসটির বাস্তব পরিচয় দান।

৩। তাদের শির্ক করার ইচ্ছা ছিলো না।

৪। তাদের এই চাওয়ার মধ্য উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর নৈকট্য লাভ। কারণ, তাদের ধারণা ছিল এটা আল্লাহ পছন্দ করেন।

৫। সাহাবাগণ যখন এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন, তখন অন্যদের অজ্ঞ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

৬। সাহাবাগণের রয়েছে এমন পূণ্য-পুরস্কার এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি, যা অন্যদের নেই।

৭। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এই ব্যাপারে সাহাবাগণের ওযর কবুল করেননি। বরং তাঁদের প্রতিবাদ ক'রে বলেন, 'আল্লাহু আকবার' এটা তো (ভ্রান্ত জাতির) রীতি-নীতি, তোমরা পূর্বের (ভ্রান্ত জাতির) রীতি-নীতির অনুসরণ করবে। এই তিনটি বাক্যের দ্বারা তিনি এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

৮। বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এটাই এখানে লক্ষণীয়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-জ্ঞাত করালেন যে, তাদের এই চাওয়া বানী ইস্রাঈলদের চাওয়ার মতনই। তারা মূসা-عليه السلام-কে বলেছিল, আমাদের জন্যও একটি উপাস্য বানিয়ে দাও।'

৯। অতি সূক্ষ্ম রহস্যবৃত হলেও এসবের বরকতের অস্বীকার করা হয়েছে। আর এটা হল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত।

১০। তিনি-ﷺ-ফাতাওয়ার উপর শপথ গ্রহণ করেছেন।

১১। শির্কের মধ্যে ছোট ও বড় রয়েছে। কারণ, এই চাওয়ার কারণে তাদেরকে মুর্তাদ ভাবা হয়নি।

১২। 'আমরা নবাগত মুসলিম ছিলাম' তাদের এ কথা থেকে জানা গেল যে, অন্যদের ওযর গ্রহণীয় নয়।

১৩। আশ্চর্য বোধ করলে, তাকবীর পাঠ করা। যারা অপছন্দ করে, তাদের বিরুদ্ধে এটা দলীল।

১৪। হাদীসে শির্কের পথ বন্ধ করা হয়েছে।

১৫। জাহেলী যুগের লোকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

১৬। শিক্ষাদানের সময় রাগান্বিত হওয়া যায়।

১৭। 'এটা পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি।' রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর এই বাক্যের দ্বারা একটি সর্বসম্মত নীতি-নীতির কথা প্রমাণিত হয়।

১৮। এটা নবূওয়াতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। কারণ, তিনি যার খবর দিয়েছেন, তা সংঘটিত হয়েছে।

১৯। আল্লাহ তাআলা যে জন্য ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান জাতির দুর্ণাম করেছেন, তা আমাদের জন্যও।

২০। তাদের সর্বসম্মত স্বীকৃতি যে, ইবাদতের মূল উৎস হল, (আল্লাহর) নির্দেশ। এ থেকে কবরের জিজ্ঞাসাবাদের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। এতে রয়েছে 'তোমার রব্ব কে? এটা জিজ্ঞাসাবাদ খুবই স্পষ্ট। আর এতে রয়েছে 'তোমার নবী কে? এটা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা অবগত হওয়া যায়। এতে আরো রয়েছে, 'তোমার দ্বীন কি? এটা তাদের কথার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, 'আমাদের জন্যও মা'বূদ নির্দিষ্ট করে দিন।'

২১। বাতিলকে ত্যাগ করে (ইসলামের) দিকে মত পরিবর্তনকারীর অন্তরে উক্ত বাতিলের কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বৃক্ষ অথবা পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করা শির্ক ও মুশরিকদের আমলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আলেমগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, বৃক্ষাদি, পাথর এবং কোনো পবিত্র স্থান ইত্যাদির মাধ্যমে বরকত অর্জন করা জায়েয নয়। এগুলোর দ্বারা বরকত অর্জন করার অর্থ হল, এগুলোর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। আর এই জিনিসই ধীরে ধীরে তার নিকট দুআ করার ও তার ইবাদতের দিকে ঠেলে দিবে। আর এটা বড় শির্কের আওতায় পড়ে। এই হুকুম সাধারণ হুকুম। তাই মাক্বামে ইব্রাহীম, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর হুযরা এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পাথরসহ কোনো মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দ্বারা বরকত অর্জন করা যাবে না। তবে হাযরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুমা দেওয়া এবং কা'বার রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা হল, আল্লাহর ইবাদত। আর এতে আল্লাহকেই সম্মান করা হয় এবং তাঁরই জন্য নত হওয়া হয়। অতএব এটা হল, স্রষ্টাকে সম্মান দেওয়া ও তাঁর ইবাদত করা। আর ওটা হল, সৃষ্টিকে সম্মান দেওয়া ও তার পূজা করা। এই দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য হল, আল্লাহর নিকট দুআ ও সৃষ্টির নিকট দুআ করার মত। আল্লাহর নিকট দুআ করা হল, তাওহীদ ও ইখলাস। আর কোনো সৃষ্টির নিকট দুআ করা হল, শরীক ও অংশীদার স্থাপন করা।

গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ﴾

[الأنعام:١٦٢-١٦٣]

"বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোনো অংশীদার নেই।" (সূরা আনআম ১৬২-১৬৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:٢]

"তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ো এবং তাঁরই জন্য কোরবানী কর।" (সূরা কাউষার ২)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَال:حَدَّثَنِي رَسُوْلُ الله ﷺ بِأَرْبَع بِكَلِمَاتٍ: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ)) [رواه مسلم]

"আলী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-চারটি জিনিস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। (আর তা হল,) তার প্রতি আল্লাহর লানত, যে তার পিতা-মাতাকে আভিসম্পাত করে। তার প্রতিও আল্লাহর লানত, যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে। আর তার প্রতি আল্লাহর লানত, যে কোনো বিদআতীকে আশ্রয় দেয়। এবং তার প্রতিও আল্লাহর লানত, যে যমীনের চিহ্ন পরিবর্তন করে দেয়।" (মুসলিম)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قال: ((دَخَلَ الجنة رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ)) قَالُوْا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: ((مَر رَجُلاَن عَلَى قَوْم لَهُمْ صَنَمٌ لاَيجوزه أَحَدٌ حَتى يُقَرّبُ لَهُ شَيْئاً، فَقَالُوْا لأَحَدهما: قرّبْ، قَالَ: لَيْسَ عنْدي شَيءٌ أُقَرّبُ، قَالُوْا لَهُ: قَربْ وَلَوْ ذُبَاباً،

فَقَرب ذُبَاباً فَخَلوا سَبيلَهُ، فَدَخَلَ النارَ. وَقَالُوْا للأخر: قَرَب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عزَ وجل، فضربوا عنقه، فدخل الجنة)) [رواه احمد]

তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে হল? তিনি বললেন, "দুই ব্যক্তি এমন এক জাতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের মূর্তি ছিল। তারা কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়তো না, যতক্ষণ না মূর্তির জন্য কোনো কিছু পেশ করতো। তারা একজনকে বলল, কিছু পেশ কর। সে বলল, আমর কাছে পেশ করার মত কিছুই নেই। তারা বলল, পেশ কর, যদিও একটি মাছি হয়। তখন সে একটি মাছি পেশ করে দিলে তারা তাকে ছেড়ে দিল। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। অতঃপর অপরজনকে বলল, পেশ কর। সে বলল, আমি গৌরবময় আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্যে কোনো কিছু পেশ করতে পারি না। তখন তারা তাকে হত্যা করে দিল। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (আহমদ)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। সূরা আনআমের আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। সূরা কাউসারের আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩। তার প্রতি লা'নতের ব্যাপার দিয়ে আরম্ভ করা, যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে।

৪। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত যে তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে। আর এটাও পিতা-মাতার প্রতি লা'নত করার পর্যায় পড়ে যে, তুমি কারো

পিতা-মাতাকে লা'নত করবে, ফলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে লা'নত করবে।

৫। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত, যে কোনো বিদাআতীকে আশ্রয় দেয়। অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যে দ্বীনে কোনো কিছু আবিষ্কার করার কারণে তার উপর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে গেল, আর তখন সে কারো আশ্রয় কামনা করল, তাকে সে আশ্রয় দিল।

৬। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত, যে যমীনের চিহ্ন (রেখা-দাগ) পরিবর্তন করে। অর্থাৎ, এমন চিহ্ন, যা তোমার ও তোমার প্রতিবেশীর যমীনের অংশের মধ্যে পার্থক্য করে, তা আগে বা পিছে সরিয়ে পরিবর্তন করা।

৭। কোনো নির্দিষ্ট মানুষের প্রতি লা'নত এবং সাধারণভাবে কারো প্রতি লা'নত করার মধ্যে পার্থক্য।

৮। একটি মাছির কারণে জান্নাতে ও জাহান্নামে যাওয়ার যে ঘটনা, তা বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

৯। মাছির কারণে জাহান্নামে গেল, অথচ তার উদ্দেশ্য তাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তি লাভ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

১০। মু'মিনদের অন্তরে শির্ক কত ভয়াবহ যে, হত্যা হওয়াকে মেনে নিল। কিন্তু তাদের সাথে তাদের চাওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পারলো না। অথচ বাহ্যিক আমল ব্যতীত তাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

১১। যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করল, সে মুসলিম ছিল। কারণ, কাফের হলে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এ কথা বলতেন না যে, "একটি মাছির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল।"

১২। এখানে বর্ণিত হাদীসটি সেই হাদীসের সমর্থন করে, যাতে আছে, “জান্নাত তোমাদের কারো নিকট তার জুতার ফিতার থেকেও নিকটে এবং জাহান্নামও অনুরূপ।”

১৩। অন্তরের আমলই বড় লক্ষণীয়। এমনকি মূর্তিপূজকদের নিকটেও।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা শির্ক। কারণ, কিতাব ও সুন্নাতে বর্ণিত দলীলাদি জবাই করাকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। যেমন, পরিষ্কারভাবে নামাযের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বহু স্থানে জবাই করাকে নামাযের সাথে উল্লেখ করেছেন। আর এ কথা যখন প্রমাণিত যে, জবাই করা মহান ইবাদত এবং বড় আনুগত্যের কাজ, তখন তা গায়রুল্লাহর নামে সম্পাদন করা হবে, ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী বড় শির্ক। কেননা, বড় শির্কের সংজ্ঞা এবং তার যে ব্যাখ্যায় সমস্ত প্রকারকে জমা করে দেওয়া হয়েছে তা হল, কোনো প্রকারের ইবাদত বা ইবাদতের কোনো কিছুকে গায়রুল্লার-নামে সম্পাদন করা। কাজেই যে কোনো বিশ্বাস অথবা কথা ও কাজ শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত হবে, তা কেবল আল্লাহর জন্য সম্পাদন করা হবে তাওহীদ, ঈমান এবং ইখলাস। আর গায়রুল্লাহর জন্য করলে তা হবে শির্ক ও কুফরী। বড় শির্কের এই সংজ্ঞা মনে রাখ, যা থেকে কোনো কিছু বাদ পড়বে না। যেমন ছোট শির্কের সংজ্ঞা হল, ইচ্ছা এবং কথা ও কাজের এমন অসীলা ও মাধ্যম, যা বড় শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তবে তা ইবাদতের ধাপে পৌঁছে না। ছোট ও বড় শির্কের এই সংজ্ঞা মনে রাখ। কারণ, এটা তোমাকে বিগত ও আগত অধ্যায় বুঝতে সাহায্য করবে। আর এরই মাধ্যমে তুমি সন্দেহজনক অনেক বিষয়ের পার্থক্য করতে পারবে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

যেখানে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা হত, সেখানে আল্লাহর নামে জবাই করা জায়েয নয়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ﴾ [التوبة:١٠٨]

"তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না।" (সূরা তাওবা ১০৮)

عَنْ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ﷺ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا: لَا، قَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ: ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) [رواه أبو داود وإسناده على شرطهما]

সাবেদ ইবনে যাহ-হাক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বাওয়ানা নামক এক স্থানে একটি উট কোরবানী করার মানত করে। আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সেখানে কি জাহেলিয়্যাতের মূর্তিসমূহের মধ্যে এমন কোনো মূর্তি ছিল, যার পূজা করা হত? সাহাবারা বললেন, না। তিনি বলেন, "সেখানে কি জাহেলিয়্যাতের উৎসবসমূহের কোনো উৎসব পালিত হত?" সাহাবারা বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, "তুমি তোমার মানত পূরণ করতে পার। কারণ, আল্লাহর অবাধ্যে কোনো মানত পূরণ করতে হয় না। আর সেই মানতও পূরণ করার দরকার নেই, আদম সন্তান যার মালিক নয়।" (আবূ দাউদ)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। "সেখানে কখনো দাঁড়াবে না।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। যমীনে পাপের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনুরূপ পুণ্যেরও ভাল প্রভাব ঘটে থাকে।

৩। অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট বিষয়ের দিকে ফিরানো জটিলতা দূরীকরণের জন্য।

৪। মুফতীর বিশ্লেষণ কামনা করা, যদি এর প্রয়োজন বোধ করে।

৫। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মানত করায় কোনো দোষ নেই, যদি নিষিদ্ধ জিনিস থেকে মুক্ত হয়।

৬। কোনো স্থানে জাহেলী যুগের কোনো মূর্তি থাকলে, সেখানে কোনো কিছুর মানত করা থেকে নিষেধ প্রদান, যদিও তা মিটিয়ে দেওয়ার পর হয়।

৭। জাহেলী যুগের কোনো ঈদ পালিত হত এমন স্থানেও কোনো কিছুর মানত করা নিষেধ, যদিও তার চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়ার পর হয়।

৮। এই ধরনের স্থানে কোনো কিছুর মানত করা হলে, তা পূরণ করা জায়েয নয়। কারণ, তা পাপাচার।

৯। মুশরিকদের উৎসবের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে সর্তকতা, যদিও তার উদ্দেশ্য তা না থাকে।

১০। পাপের কাজে কোনো মানত করতে হয় না।

১১। এমন জিনিসের মানত আদম সন্তান করবে না, যার সে মালিক নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পূর্বের অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়ের বড় সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। আগের অধ্যায়ে ছিল বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত জিনিস। আর এই অধ্যায় হল, শির্কের খুব নিকটতম মাধ্যমের ব্যাপারে। কারণ, যে স্থানে মুশরিকরা তাদের

উপাস্যদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সাথে শির্ক করে জবাই করত, তা শির্কের স্থানসমূহের এক স্থানে পরিণত হয়ে গেছে। তাই কোনো মুসলিম যদি সেখানে কোনো পশু জবাই করে, তাহলে তা আল্লাহর জন্যে হলেও মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণে পরিণত হবে এবং শির্কে তাদের সাথে শরীক করা হবে। আর বাহ্যিক (কার্যকলাপে) তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ, অভ্যন্তরীণ (কার্যকলাপে) তাদের সাদৃশ্য গ্রহণের এবং তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার দাওয়াত দেবে। আর এই জন্যেই চাল-চলনে, ঈদে-উৎসবে এবং পোশাক-পরিচ্ছদসহ যাবতীয় বিষয়ে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে ইসলাম নিষেধ দান করেছে। যাতে মুসলিমদেরকে এমন বাহ্যিক বিষয়ে তাদের মত হওয়া থেকে দূরে রাখা যায়, যা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার মাধ্যম ও অসীলা। এমন কি তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে বাঁচার জন্য নিষিদ্ধ সময়ে নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এই সময় মুশরিকরা গায়রুল্লাহকে সাজদা করে থাকে।

গায়রুল্লাহর নামে মানত করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الدهر: ٧]

"তারা মানত পূরণ করে।" (সূরা দাহার ৭) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠]

"তোমরা যা কিছু দান-খয়রাত কর কিংবা যে মানত তোমরা কর, আল্লাহ নিশ্চয় সেসব কিছু জানেন।" (সূরা বাক্বারা ২৭০)

وفي الصحيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَن رسول الله ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ

يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ))

সহী হাদীসে আয়েশা-রাযীআল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফারমানী করার মানত করে, সে যেন তাঁর নাফারমানী না করে।”

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। মানত পূরণ করা ওয়াজিব।

২। যখন প্রমাণ হলো যে, (মানত) আল্লাহর ইবাদত, তখন তা অন্যের জন্য করা শির্ক হবে।

৩। পাপের কাজের মানত করলে, তা পূরণ করা জায়েয নয়।

গায়রুল্লাহর আশ্রয় কামনা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾

“আর কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তারা জ্বিনদের অহঙ্কার বাড়িয়ে দিত।” (সূরা জ্বিন ৬)

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ)) [رواه مسلم]

খাওলা বিনতে হাকীম (রাযীয়া আল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করার পর “আঊযু বি কালিমা-তিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক্ব” (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি) পাঠ করে, সেই স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোনো জিনিস তার অনিষ্ট করতে পারবে না।” (মুসলিম)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। সূরা জ্বিনের আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। গায়রুল্লাহর আশ্রয় চাওয়া শির্ক।

৩। গায়রুল্লাহর সাহায্য চাওয়াও শির্ক তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, আলেমগণ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর বাক্যসমূহ সৃষ্ট নয়। কারণ, সৃষ্টির আশ্রয় চাওয়া শির্ক।

৪। সংক্ষিপ্ত হলেও এই দুআর ফযীলত অনেক।

৫। কোনো জিনিস দ্বারা পার্থিব কোনো লাভ অর্জন হওয়া এ কথা প্রমাণ করে না যে, তা শির্ক নয়। যেমন কোনো ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ অথবা কোনো উপকার অর্জন।

গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া, গায়রুল্লাহকে আহ্বান করা শির্ক

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [يونس:١٠٦-١٠٧]

“আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে আহ্বান করো না, যা না তোমার কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি করতে পারে।

বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ইউনুস ১০৬-১০৭) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٧]

"তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ করো এবং তাঁরই ইবাদত কর। (সূরা আনকাবূত ১৭) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأحقاف:٥]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন সত্তাকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?।" (সূরা আহক্বাফ ৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل:٦٢]

"বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেয়, যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করে।" (সূরা নামাল ৬২) ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর যামানায় এক মুনাফেক ছিল যে মু'মিনদের কষ্ট দিত তাই কেউ কেউ বলল, চলো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট এই মুনাফেক থেকে নিষ্কৃতির জন্য সাহায্য কামনা করি। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন,

((إنه لاَ يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَما يسْتَغَاثُ بالله)) [رواه الهيثمي في مجمع الزوائد]

"আমার নিকট সাহায্য কামনা করতে হয় না, বরং আল্লাহর নিকটই সাহায্য কামনা করতে হয়।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। দুআকে সাহায্য চাওয়ার সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে, সাধারণ জিনিসকে বিশেষ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করা।

২। সূরা ইউনুসের আয়াতের তাফসীর।

৩। এটা (গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া) হল, বড় শির্ক।

৪। কোনো সৎলোক গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যদি তা করে, তবে সে যালিমদের দলভুক্ত হবে।

৫। পরের আয়াতের তাফসীর।

৬। কুফরী হওয়ার সাথে সাথে তা দুনিয়াতেও কোনো উপকারে আসবে না।

৭। তৃতীয় আয়াতের তাফসীর।

৮। রুজী কেবল আল্লাহর নিকট কামনা করা উচিত। অনুরূপ জান্নাতও তাঁরই নিকট চাইতে হয়।

৯। চতুর্থ আয়াতের তাফসীর।

১০। যে গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তার চেয়ে অধিক ভ্রষ্ট আর কেউ নেই।

১১। যাকে ডাকে, সে আহ্বানকারীর ব্যাপারে উদাসীন। তার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।

১২। যাকে ডাকা হয়, এই ডাক তার প্রতি আহ্বানকারীর অসন্তুষ্টির ও শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৩। যাকে ডাকা হয়, এই ডাক তার ইবাদতের নামান্তর।

১৪। যাকে ডাকা হয়, এই ইবাদতের কারণে তার কুফরী সাব্যস্ত হয়।

১৫। এই আহ্বানই আহ্বানকারীকে সর্বাধিক ভ্রষ্ট মানুষে পরণিত করে।

১৬। পঞ্চম আয়াতের তাফসীর।

১৭। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মূর্তি পূজকরাও স্বীকার করে যে, নিঃসহায়ের ডাকে আল্লাহ ছাড়া কেউ সাড়া দিতে পারে না। আর এই কারণেই তারা ভয়াবহ বিপদে কেবল আল্লাহকেই ডাকত।

১৮। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর তাওহীদের সমর্থন এবং আল্লাহর প্রতি আদব শিক্ষা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বিগত অধ্যায়ে উল্লিখিত বড় শির্কের যে সংজ্ঞা বলা হয়েছে, অর্থাৎ, (যে ব্যক্তি ইবাদতের কোনো কিছুকে গায়রুল্লাহর জন্য সম্পাদন করে, সে মুশরিক বিবেচিত হয়) এই সংজ্ঞা বুঝে থাকলে, এই তিনটি অধ্যায়, যা লেখক পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করেছেন, বুঝতে সক্ষম হবে। কেননা, মানত করা একটি ইবাদত। মানত পূরণকারী আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আনুগত্যের মানত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যেসব কাজের শরীয়ত প্রশংসা করেছে, অথবা তার সম্পাদনকারীর তারীফ করেছে কিংবা তার নির্দেশ দিয়েছে, তা ইবাদত বলেই গণ্য হয়। কারণ, ইবাদত হল, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় কথা ও কাজের এমন এক নাম, যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট আর মানত এরই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ আল্লাহ প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচতে তাঁরই নিকট আশ্রয় কামনা করার এবং প্রত্যেক কষ্ট ও বিপদ থেকে রক্ষার জন্য তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করলে, তা হবে ঈমান ও তাওহীদ। কিন্তু তা গায়রুল্লাহর কাছে করলে, তা হবে শির্ক।

'দুআ'(প্রার্থনা করা)। আর 'ইস্তিগাষা' (ফরিয়াদ করা)-এর মধ্যে পার্থক্য হল, দুআ সাধারণ, যা প্রত্যেক অবস্থাতেই করা হয়। কিন্তু ইস্তিগাষা বা

ফরিয়াদ হল, আল্লাহকে বিপদের সময় ডাকা। এ সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। তিনিই প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা শোনেন। তিনিই বিপদগ্রস্তদের উদ্ধার করেন। কাজেই যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো নবী, ফেরেশতা, ওলী অথবা অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করে কিংবা যদি গায়রুল্লাহর কাছে এমন কিছু কামনা করে, যা কেবল আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, তাহলে সে মুশরিক ও কাফের গণ্য হবে। আর যেহেতু সে দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত, সেহেতু সে জ্ঞানশূন্যও বিবেচিত হবে। কেননা, সৃষ্টির কারো কাছে অণু পরিমাণও উপকারিতা নেই। না সে নিজের জন্য কিছু করতে পারে, আর না অপরের জন্য। বরং সকলেই তাদের প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহরই মুখাপেক্ষী।

অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾
[الأعراف ١٩١-١٩٢]

"তারা কি এমন বস্তুকে অংশী-স্থাপন করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। ওরা তাদের কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারে না।" (সূরা আ'রাফ **১৯১-১৯২**) তিনি আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر:١٣]

"আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়।" (সূরা ফাত্বির **১৩**) সহী হাদীসে আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ–ﷺ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: ((كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ

شَـجُّوا نَبِـيَّهُـمْ، وَكَسَرُـوا رَبَاعِيَتَـهُ، وَهُـوَ يَـدْعُوهُـمْ إِلَى اللهِ؟))، فَـأَنْزَلَ اللهُ عَـزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [رواه البخاري ومسلم]

ওহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে গেল (সামনের দাঁতের ডান পাশের দাঁতটি ভেঙ্গেছিল) দিকের এবং তাঁর মাথা আহত হয়েছিল। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন আর বলছিলেন, "এমন জাতি কেমন করে সফলকাম হতে পারে, যারা তাদের নবীকে আহত ক'রে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দেয়? অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় "এ ব্যাপারে তোমার কোনো হাত নেই।"

সহী হাদীসেই ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, যে, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে ফজরের শেষের রাকআতে রুকু থেকে উঠার পর এবং 'সামিআল্লাহু লিমানহামিদাহ রাব্বানা লাকাল হামদু' বলার পর এই কথা বলতে শুনেছেন, "হে আল্লাহ অমুক ও অমুকের উপর লানত বর্ষণ কর! তখন আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "এ ব্যাপারে তোমার কোনো হাত নেই।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা, সোহাইল ইবনে আমর এবং হারিস ইবনে হিশামের উপরে বদ্দুআ করলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, "এ ব্যাপারে তোমার কোনো হাত নেই।"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْـزَلَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ ﴿وَأَنْـذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اشْتَرُوا أَنْفُسَـكُمْ

لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ الله شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ الله شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ الله شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ الله لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ الله شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ الله شَيْئًا)) [رواه البخاري ومسلم]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর যখন এই আয়াত "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন" অবতীর্ণ হল, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে কুরায়েশগণ অথবা এই ধরনের কোনো বাক্য, তোমরা নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা করে নাও। আমি তোমাদের হয়ে আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারবো না। হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস, আমি তোমার হয়ে আল্লাহর কাছে কিছুই করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ফুফু সাফিয়্যা আমি তোমার হয়ে আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে মুহাম্মাদের বেটী ফাতেমা, আমার মাল-ধন থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি তোমার হয়ে আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না।"

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা।

২। ওহুদের ঘটনা।

৩। সাইয়েদুল মুর্সালীন মুহাম্মাদ-ﷺ-এর নামাযে কুনুত পাঠ এবং তাঁর পিছনে সাহাবায়ে কেরামদের আমীন বলা।

৪। যাদের উপর বদ্দুআ করা হয়েছে তারা কাফের ছিল।

৫। তারা এমন কিছু কাজ করে ছিল, যা অধিকাংশ কাফেররা করেনি। যেমন, তাদের নবীকে আঘাত দেওয়া এবং তাঁকে হত্যা করতে আগ্রহী হওয়া। অনুরূপ মৃতদের শারীরিক বিকৃতি ঘাটানো, অথচ তারা তাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত।

৬। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তাঁর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, "এ ব্যাপারে তোমার কোনো হাত নেই।"

৭। আল্লাহর বাণী, "হয় আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, না হয় তাদের শাস্তি দিবেন।" আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন এবং তারা ঈমান আনল।

৮। বিপদের সময় দুআয়ে কুনুত পড়া।

৯। বদ্দুআকৃত লোকদের নাম এবং তাদের পিতাদের নাম উল্লেখ করা।

১০। নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর অভিসম্পাত করা।

১১। "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন!" এই আয়াত অবতীর্ণ হলে নবী করীম-ﷺ-যা করে ছিলেন, তার ঘটনা।

১২। সত্যের প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ-ﷺ-চরম সংগ্রাম করেছিলেন। এমন কি তাঁকে পাগল বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আজও যদি কোনো মুসলিম সত্যের প্রচার করতে যায়, তাকেও অনুরূপ বলা হবে।

১৩। নিকট আত্মীয় ও দূরাত্মীয় সকলের জন্য রাসূলের এই বাণী, "আমি তোমার হয়ে আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না।" এমনকি বললেন, "হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ আমি তোমার হয়েও আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারবো না।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এবারে তাওহীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করা আরম্ভ হল। তাওহীদের

প্রমাণে রয়েছে কুরআন ও হাদীস সহ যুক্তি-সম্বন্ধীয় এমন অনেক দলীল, যা অন্য বিষয়ের উপর নেই। পূর্বে উল্লিখিত তাওহীদে রুবূবিয়্যা তথা প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ এবং তাওহীদে আসমা অসসিফাত তথা নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ, এই দু'টিই হল তাওহীদের সব চেয়ে বড় ও বলিষ্ঠ দলীল। কেননা, যিনি একমাত্র স্রষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক এবং সব দিক দিয়েই যিনিই একমাত্র পরিপূর্ণ, তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য আর কেউ হতে পারে না। অনুরূপ সৃষ্টির ও আল্লাহর সাথে যার পূজা করা হয়, তাদের গুণাবলী সম্পর্কে অবগতি লাভও তাওহীদের বড় দলীল। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, তাতে সে কোনো ফেরেশতা হোক, মানুষ হোক, বৃক্ষ হোক এবং পাথর ও অন্য যেই হোক না কেন, এ সবই আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং দুর্বল। এদের হাতে অণু পরিমাণও কোনো উপকারিতা নেই। এরা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। এরা ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। মহান আল্লাহই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টের স্রষ্টা, তাদের আহারদাতা, সবকিছুর পরিচালক, ইষ্টানিষ্টের মালিক, দাতা ও রোধকারী, তাঁরই হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, সকল জিনিসের প্রত্যাবর্তন তারঁই দিকে, তাঁরই কাছে আশা করে এবং তারঁই সমীপে নত হয়।

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের বহু স্থানে এবং তাঁর রাসূলের জবানি বারংবার যে দলীলের উল্লেখ করেছেন, তার চেয়ে বড় দলীল আর কি হতে পারে? ওটা যেমন আল্লাহর একত্ববাদের এবং তাঁর সত্যবাদিতার যুক্তিসংগত ও প্রকৃতিগত দলীল, তেমনি ওটা শ্রবণ-সম্বন্ধীয় শরীয়তী দলীলও বটে। অনুরূপ তা শির্ক বাতিল হওয়ারও দলীল।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ (মুহাম্মাদ-ﷺ-) তাঁর সব চেয়ে নিকটের যে এবং যার প্রতি তিনি বেশী করুণাসিক্ত, তারই যখন কোনো উপকার করার অধিকার রাখেন না, তখন অপরের কি করতে পারেন? কাজেই ধ্বংস হোক সে, যে আল্লাহর সাথে শরীক করে এবং সৃষ্টির কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করে। তার দ্বীন বিলুপ্ত হওয়ার পর তার বিবেক-বুদ্ধিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহর গৌরবময় গুণাবলী এবং তাঁরই কেবল পূর্ণতার অধিকারী হওয়া, সব থেকে বৃহৎ দলীল যে, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

সৃষ্টির যাবতীয় গুণাবলী, তার মধ্যে বিদ্যমান ঘাটতি, প্রত্যেক ব্যাপারে স্বীয় প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং তার প্রতিপালক যতটুকু পূর্ণতা দিয়েছেন, তা ব্যতীত কোনো কিছুর অধিকার না রাখা, এ সবই তার উপাস্য হওয়ার অযোগ্যতাকে প্রমাণ করে। সুতরাং যে আল্লাহ এবং সৃষ্টি সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে, তার এই অবগতি তাকে বাধ্য করবে কেবল আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর জন্য দ্বীনকে খালেস করতে, তাঁর প্রশংসা করতে, জবান ও অন্তরের দ্বারা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে এবং সৃষ্টির উপর কোনো আস্থা না রাখতে। আর এ সবই হবে, ভীতি, আশা ও লোভে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অধ্যায়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ﴾ [سبأ:٢٣]

"যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান।" (সূরা সাবা ২৩)

في الصحيح عَنْ أَبِي هريرةَ ﷺ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: ((إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ، ﴿فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضهُ فوق بعض، وصفه سُفيان بن عيينة بكفه، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ، فحرَّفها وبدّد بين اصحابه، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فيُلقيْهَا إِلَى مَنْ تَحته، ثُم يُلْقِيهَا الآخَرُ إلى مَنْ تَحتهُ، حَتى يُلْقِيْهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الْكَاهِنِ، فرُبمَا أَدْرَكَهُ الشهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقيْهَا. وَرُبمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَة فَيُقَالُ: اَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فيُصدّق بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِيْ سُمعَتْ مِنَ السَّمَاءِ)) [رواه البخاري ومسلم]

সহী হাদীসে আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহ যখন আসমানে কোনো বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর কথায় বিনয়-নম্র হয়ে ফেরেশগণ তাঁদের ডানাগুলো এমনভাবে নাড়াতে থাকেন, যেন কোনো শক্ত পাথরের উপর শিকল পড়েছে। ফেরেশতাদের

অন্তরে তা দোলা দেয়। "যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান।" তখন চুরি ক'রে কথা শ্রবণকারীরা তা শুনে নেয়। হাদীসের বর্ণনাকারী সাফওয়ান এই হাদীস বর্ণনায় 'চুরি ক'রে কথা শ্রবণকারী' শব্দ সম্পর্কে হাতের ইশারায় আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে দেখিয়েছেন যে, এইভাবে এই শ্রবণ-কারীরা অধিক সংখ্যায় উপরে নিচে প্রসারিত থেকে কথা শোনে। তার পর তার নিকটের কোনো ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। অবশেষে তা কোনো যাদুকর বা কোনো গণকের জবানি পৃথিবীতে পৌঁছায়। কখনোও কখনোও চুরিতে শ্রবণকারীর উপর তা পৌঁছানোর পূর্বেই অগ্নি বর্ষণ হয়। আবার কখনোও কখনোও অগ্নি বর্ষণের পূর্বেই তা পৃথিবীতে পৌঁছে দেয় এবং প্রাপক তার সাথে শত শত মিথ্যা মিশ্রিত করে। তখন বলা হয়, অমুক অমুক দিনে কি আমাদেরকে এই কথা বলা হয় নি? তখন আসমান থেকে শোনা সেই কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়।"

وعَنِ النوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَن يُوْحِيَ بِا لأَمْرِ، وَتَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةً، أَوْ قَالَ: رَعْدَةً شَدِيْدَةً، خَوْفاً مِّنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوْا وَخَرُّوْا للهِ سُجَّدًا فَيَكُوْنُ أَوَّلَ مَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيْلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيْلُ عَلَى المَلاَئِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ

رَبُّنَا يَا جِبْرِيْلُ؟ فَيَقُوْلُ جِبْرِيْلُ: قَالَ الحَق، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيْرُ، فَيَقُوْلُوْنَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيْلُ، فَيَنْتَهِيْ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ))

নাওয়াস ইবনে সামআন-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন মহান আল্লাহ অহী প্রেরণের ইচ্ছা করেন এবং সেই অহীর বাক্য প্রয়োগ করেন, তখন আকাশ ও যমীনসমূহে মহিমান্বিত আল্লাহর ভয়ে কম্পন অথবা বিকট শব্দের সৃষ্টি হয়। যখন আকাশবাসী তা শোনে, তখন তাঁরা চেতনা হারিয়ে ফেলেন এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়ে যান। অতঃপর জিবরীল-عليه السلام-সর্বপ্রথম মাথা তুলেন এবং আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অহীর কথা বলে দেন। তারপর জিবরীল-عليه السلام-অন্যান্য ফেরেশতাদের নিকট গমন করেন। প্রত্যেক আকাশের ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন, হে জিবরীল! আমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন, তখন জিবরীল-عليه السلام-বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর সকল ফেরেশতা জিবরীল-عليه السلام-এর ন্যায় বলতে থাকেন। এইভাবে জিবরীল-عليه السلام-অহী নিয়ে সেই স্থান পর্যন্ত গমন করেন, যেখানে যাওয়ার নির্দেশ মহান আল্লাহ দিয়েছেন।"

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, শির্ক বাতিল। বিশেষতঃ সেই শির্ক, যার সম্পর্ক নেক লোকদের সাথে। এই আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, এটা অন্তর থেকে শির্কের মূলোৎপাটন করে।

৩। আল্লাহর এই বাণীর ব্যাখ্যা, "তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান।"

৪। এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করার কারণ।

৫। জিবরীল তাদেরকে উত্তর দেন যে, আল্লাহ এই এই বলেন।

৬। সর্ব প্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হলেন জিবরীল।

৭। তিনি সকল আসমানবাসীর কথার উত্তর দেন যখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করে।

৮। সকল আসমানবাসীই অজ্ঞান হয়ে যায়।

৯। আল্লাহর কালেমার কারণে আসমানে কম্পন সৃষ্টি হয়।

১০। জিবরীল-عليه السلام-সেখানে পৌঁছান, যেখানে আল্লাহ নির্দেশ দেন।

১১। শয়তানরা যে চুরি করে কথা শোনে, তার উল্লেখ।

১২। একে অপরকে কিভাবে কথা পৌঁছায় তার বর্ণনা।

১৩। অগ্নি প্রেরণ।

১৪। কখনো এই অগ্নি ওলীর কানে কথা পৌঁছানোর পূর্বেই তাকে পেয়ে বসে। আবার কখনো সে তার উপর আগুন প্রেরিত হওয়ার পূর্বেই তার ওলীর কানে কথা পৌঁছে দেয়।

১৫। কখনো কখনো গণকরা সত্য বলে।

১৬। তারা একটি সত্যের সাথে একশত মিথ্যা মিশ্রিত করে।

১৭। তাদের সেই কথাটাই সত্য হয়, যা আসমান থেকে চুরি করে শোনা হয়।

১৮। মানুষের অন্তর মিথ্যা এমনভাবে গ্রহণ করে যে, একটি সত্যের প্রতি লক্ষ্য করে, অথচ একশত মিথ্যার প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

১৯। এই সত্য কথাটা তারা একে অপরের নিকট পৌঁছায় এবং এরই দ্বারা দলীল কায়েম করে।

২০। আল্লাহর গুণের প্রমাণ, যদিও বিভ্রান্ত আশআরী দল তা মানে না।

২১। এ কথা পরিষ্কার করে জানা গেলো যে, আসমানবাসীদের অজ্ঞান হওয়া এবং আসমানে কম্পন সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল আল্লাহর ভয়।
২২। তাঁরা আল্লাহর জন্য সাজদায় পড়ে যান।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই তাওহীদ ওয়াজিব হওয়ার এবং শির্ককে বাতিল সাব্যস্ত করার খুব বড় প্রমাণ। এখানে কুরআন ও হাদীসের এমন কথার উল্লেখ হয়েছে, যার দ্বারা মহান প্রতিপালকের বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়, যাঁর মাহাত্ম্যের সামনে সৃষ্টির মাহাত্ম্য কিছুই থাকে না। যাঁর সামনে ফেরেশতাগণ এবং উভয় জগৎ নত হয়ে যায়। তাঁর কালাম শোনার সময় তাঁরা (ফেরেশতারা) তাঁদের অন্তরকে স্থির রাখতে পারে না। সকল সৃষ্টিই তাঁর গৌরবের সামনে নতি স্বীকার করে, তাঁর মাহাত্ম্য ও মহিমাকে স্বীকার করে এবং তাঁর ভয়ে নত হয়। তাই যে সত্তার এই শান, তিনিই প্রতিপালক। তিনি ইবাদত, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা পাবার একমাত্র যোগ্য। সম্মান পাবার এবং উপাস্য হওয়ার অধিকার তিনিই রাখেন। তিনি ব্যতীত এই অধিকারের কোনো কিছুই কেউ পেতে পারে না। যেমনি তিনিই পূর্ণতা, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং গৌরব ও সৌন্দর্যের গুণে গুণান্বিত, তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ সব গুণে গুণান্বিত হতে পারে না, তেমনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত হল তাঁরই নির্দিষ্ট অধিকার। কোনোভাবেই এতে কেউ শরীক হতে পারে না।

শাফাআ'ত প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ [الأنعام:٥١]

"আপনি এ কুরআন দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না।" (সূরা আনআম ৫১) তিনি আরো বলেন,

﴿قُل لِلهِ الشَّفعَةُ جَمِيْعا﴾ [الزمر: ٤٤]

"বল, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমাধীন।" (সূরা যুমার ৪৪) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [ابقرة:]

"কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?" (সূরা বাক্বারা ২৫৫) তিনি আরো বলেন,

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النَّجم:٢٦]

"আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।" (সূরা নাজম ২৬) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ:٢٣-٢٢]

"বল, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য

মনে করতে। তারা নভোমণ্ডল ও ভু-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোনো অংশ নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।" (সূরা সাবা ২২-২৩)

আবুল আব্বাস (ইবনে তাইমিয়া) বলেন, মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যে সবের উপর আস্থা রেখেছিল, আল্লাহ সে সবের অস্বীকৃতি ঘোষণা করেছেন। কাজেই গায়রুল্লাহর কোনো কিছুর মালিক হওয়া অথবা কোনো কিছুতে তাদের অংশ থাকা বা আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া সব কিছুর অস্বীকার করেছেন। এখন সুপারিশের ব্যাপারটা বাকী ছিল, তাই বলে দেওয়া হল যে, এই সুপারিশ কেবল তারই উপকারে আসবে, যার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন। যেমন, আল্লাহ বলেন, "তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া ২৮) সুতরাং মুশরিকরা কিয়ামতের দিন যে সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করে, কুরআর তার অস্বীকৃতি দেয়। আর নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَ يَحْمَدُهُ-لاَ يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً- ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ تُسْمَع، وَسَلْ تُعْطَ واشْفعْ تُشَفعْ)) [رواه البخاري ومسلم]

"তিনি তাঁর প্রতিপালকের সামনে এসে সাজদা করবেন এবং অনেক প্রশংসা করবেন। তিনি প্রথমেই সুপারিশ করতে আরম্ভ করবেন না। অতঃপর তাঁকে বলা হবে, তুমি মাথা তুলো। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে।" আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন,

((مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ)) [رواه البخاري]

"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে কে আপনার সুপারিশ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভে করবে? তিনি বললেন, "যে নিষ্ঠার সাথে অন্তর থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-পাঠ করবে।" (বুখারী) তাই এই সুপারিশ হবে আল্লাহর অনুমতিতে নিষ্ঠাবানদের জন্যে। আল্লাহর সাথে শরীককারীদের জন্যে হবে না।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা নিষ্ঠাবান লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তাই যিনি সম্মান প্রাপ্ত হয়ে শাফাআতের অনুমতি লাভ করবেন এবং 'মাক্বামে মাহমুদ' লাভ করবেন, তাঁর দুআর মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। সেই শাফাআতের কুরআন অস্বীকৃতি দিয়েছে, যাতে শির্ক আছে। আবার কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহর অনুমতিক্রমে শাফাআত সাব্যস্ত হয়েছে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন যে, শাফাআত তাও-হীদবাদী ও নিষ্ঠাবান লোকদের জন্যেই নির্দিষ্ট।

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা।
২। নিষিদ্ধ শাফাআতের বর্ণনা।
৩। প্রমাণিত শাফাআতের বর্ণনা।
৪। বড় শাফাআতের উল্লেখ। আর তা হল মাক্বামে মাহমুদ।
৫। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কিভাবে শাফাআত করবেন, তার বর্ণনা। তিনি প্রথমেই শাফাআত করবেন না, বরং আল্লাহর জন্য সাজদা করবেন। যখন তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে, তখন তিনি শাফাআত করবেন।

৬। কে সুপারিশ দ্বারা ধন্য হবে?
৭। মুশরিকদের জন্য সুপারিশ হবে না।
৮। প্রকৃত শাফাআতের বর্ণনা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

লেখক এখানে (শির্কীয় অধ্যায়ের সাথে) শাফাআতের অধ্যায়কে বৃদ্ধি করেছেন। কারণ, মুশরিকরা তাদের শির্ক এবং ফেরেশতা, আম্বিয়া ও ওলীদের নিকট তাদের প্রার্থনা করাকে এইভাবে সঠিক সাব্যস্ত করত যে, আমরা তাঁদের নিকট প্রার্থনা করি, তবে আমরা জানি যে তাঁরা সৃষ্টি ও অন্যের দাস। কিন্তু আল্লাহর নিকটে তাঁদের যেহেতু সুমহান মর্যাদা ও উচ্চ স্থান রয়েছে, তাই তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহর সানিধ্যে করে দিতে পারবেন এবং আমাদের জন্য তাঁর নিকট সুপারিশও করতে পারবেন। যেমন নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজা-বাদশাহদের নিকট সম্মানী ব্যক্তিদের নৈকট্য লাভ ক'রে তাদেরকে মাধ্যম বানানো হয়। আর এ হলো সমস্ত বাতিলের বড় বাতিল। অনুরূপ এটা হল মহান আল্লাহ এবং সম্রাটের সম্রাট যাঁকে সকলই ভয় করে ও যাঁর সামনে সমস্ত সৃষ্টিকুল নতি স্বীকার করে, সেই সত্তার সাথে এমন রাজাদের সাদৃশ্য স্থাপন করা, যারা তাদের রাজত্বের পূর্ণতার জন্য এবং নিজেদের শক্তির বাস্তবায়নের জন্য বহু মন্ত্রী ও সহযোগীর মুখা-পেক্ষী হয়। তাই আল্লাহ এই (সুপারিশ লাভের) ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন এবং পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্ত সুপারিশ তাঁরই ইখতিয়ারাধীন। যেমন সমস্ত রাজত্ব তাঁরই। তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আর তিনি যার কথা

ও কাজে সন্তুষ্ট, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে অনুমতি দিবেন না। আর তিনি কেবল তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যে তাওহীদবাদী ও আমলে নিষ্ঠাবান হয়।

এখানে এ কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকের জন্য কোনো সুপারিশ থাকবে না। এ কথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে যে শাফাআত বাস্তবায়িত হবে, তা কেবল নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট। আর এই সমস্ত শাফাআত আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত-স্বরূপ, সুপারিশকারীর সম্মানার্থে এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য হবে। তাই সেই সত্তাই প্রশংসা অধিকারী, যিনি মুহাম্মদ-ﷺ-কে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন এবং তাঁকে মাক্বামে মাহমুদ দান করবেন। আর এটাই হবে কুরআন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত শাফাআত। লেখক (রাহঃ) শাফাআত সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যার যে উক্তির উল্লেখ করেছেন তা-ই যথেষ্ট।

শাফাআতের অধ্যায়কে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, সেই সব দলীলগুল তুলে ধরা, যা প্রমাণ করে যে, যে সমস্ত উপাস্যগুলোকে মুশরিকরা অসীলা ও মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে তাদের উপর আস্থাবান হয়, তা সবই বাতিল। তারা না নিজেই কোনো কিছুরই মালিক, না কোনো কিছুতে তারা শরীক, আর না কোনো কিছুর সাহায্য-সহযোগিতা তারা করতে পারে, আর না শাফাআতের কোনো অধিকার তারা রাখে। এই সমস্ত কিছুর মালিক হলেন কেবল আল্লাহ। সুতরাং উপাস্যও একমাত্র তিনিই

অধ্যায়
'আপনি যাকে চান, তাকে হেদায়াত দিতে পারেন না'

فِي الصَّحِيْحِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْهِ:أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: ((أَيْ عَمِّ، قُلْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالاَ: يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، قَالَ: آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ فَنَزَلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ وَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [رواه البخاري ومسلم]

সহী হাদীসে ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেন, যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার নিকট উপস্থিত হোন। আর তখন তার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমায়্যা এবং আবূ জেহেল ছিল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাকে বললেন, "হে চাচা, বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এটা একটি বাক্য আমি তার দ্বারা আল্লাহর নিকট আপনার ক্ষমা করিয়ে নিব।" তখন তারা (আবূ উমায়্যা ও আবূ জাহল) তাকে বলল, তুমি কি আব্দুল মুত্তাল্লীবের ধর্ম থেকে ফিরে যেতে চাও? অতঃপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারাও পুনরাবৃত্তি করল। আবূ তালিবের শেষ বাক্য ছিল এই যে, সে আব্দুল মুত্তাল্লীবের ধর্মেই কায়েম রয়েছে এবং সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে অস্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হবে। তখনই আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, "মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট

হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।” (সূরা তাওবা ১১৩) আর মহান আল্লাহ এই আয়াতও অবতীর্ণ করেন, “তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়েত দিতে পারো না, বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়েত দান করেন।” (সূরা ক্বাসাস ৫৬)

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। ‘তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়েত দিতে পারো না’ এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

২। প্রথম আয়াতটির তফসীর।

৩। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর এই বাণীর, “বলুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ প্রকৃত ব্যাখ্যার উপলব্ধি। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা যা এক শ্রেণীর বিদ্যানদের দাবীর পিরীত।

৪। আবূ জাহল ও তার সঙ্গী-সথীরা যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর চাচাকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করতে বললেন, তখন তার তাৎপর্য কি তা বুঝতে পেরে ছিল। আবূ জাহলকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! তার চেয়ে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে কে বেশী জ্ঞাত ছিল?

৫। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অত্যধিক প্রচেষ্টা তাঁর চাচার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে।

৬। তাদের খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করে যে, আব্দুল মুত্তালীব ও তার সহচররা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

৭। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি, বরং নিষেধ করা হয়েছে।

৮। অসৎ সঙ্গী-সাথীর ক্ষতি।

৯। বড়দের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার ক্ষতি।

১০। এ ব্যাপারে বাতিলপন্থীদের সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ আবূ জেহেল বড়দেরকে দলীলে পেশ করেছে।

১১। শেষ আমলই লক্ষণীয়। কারণ, সে যদি কালেমা পড়ত, তাহলে তাতে সে উপকৃত হতো।

১২। গোমরাহ লোকদের অন্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহের মধ্যে চিন্তনীয় বিষয় রয়েছে। কেননা, উল্লিখিত ঘটনায় তারা এমনভাবে পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুসারী ছিল যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অত্যধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুসরণই তাদের উপর প্রাধান্য পেল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়টিও পূর্বের অধ্যায়ের মতনই। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব এবং মর্যাদা-সম্মানে আল্লাহর নিকট সব থেকে মহান। আর অসীলার দিক দিয়ে তিনিই আল্লাহর সর্বাধিক নিকটের বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর চাচাকে হেদায়াত দিতে পারননি। কেননা, তিনিই হেদায়াতের মালিক, হেদায়াত তাঁরই হাতে। যেমন কেবল তিনিই সৃষ্টির স্রষ্টা। সুতরাং সত্য উপাস্যও তিনিই। তবে আল্লাহ যে বলেছেন, “নিঃসন্দেহে তুমি সঠিক-সোজা পথের দিকে লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করছ।” (শুরা ৫২) তো এর অর্থ হল, হেদায়াতের পথ দেখানো, হেদায়াত দান করা নয়। তিনি ছিলেন আল্লাহর সেই অহীর বাহক, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে হেদায়াত দান করেছেন।

নেক লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা প্রসঙ্গে

আদম সন্তানের কুফরী ও দ্বীন ত্যাগ করার কারণ হল, নেক লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]

“হে গ্রন্থধারীগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।” (সূরা নিসা ১৭১)

فِي الصَّحِيْحِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُن آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُن وَدّا وَلا سُوَاعا وَلا يَغُوْث وَيَعُوْكَ وَنسْرا﴾ [نوح:٢٣] قَالَ: هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوْا أَوْحَي الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَنِ انصِبُوْا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِيْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ فِيْهَا أَنْصَاباً وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوْا، وَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُوْلَئِكَ وَنُسِيَ العِلْمُ، عُبِدَتْ))

সহী হাদীসে ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি “তারা বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে।” (নূহ ২৩) মহান আল্লাহর এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, এগুলো নূহ-عليه السلام-এর জাতির নেক লোকদের নাম। তাঁরা যখন মারা গেল, শয়তান তখন তাঁদের জাতির অন্তরে এই কথা প্রবেশ করিয়ে দিল যে, তাঁরা যেখানে বসতেন, সেখানে তাঁদের মূর্তি স্থাপন করে তাঁদের নামে নামকরণ করা হোক। তখন তারা তা-ই করল। তবে তখন তাদের পূজা করা হত না। অতঃপর যখন এই সব লোক মারা গেল এবং প্রকৃত তথ্য ভুলিয়ে দেওয়া হল, তখন পূজা আরম্ভ হয়ে গেল। (বুখারী)

ইবনুল কাইয়ূম (রাহঃ) বলেন, পূর্বের অনেক লোক বলেছেন, তাঁরা যখন মারা গেলেন, লোকজন তখন তাঁদের কবরে বসতে আরম্ভ করল।

তারপর তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করল। অতঃপর দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের পূজা শুরু হয়ে গেল।

عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)) [أخرجاه]

উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে ঐরূপ বাড়াবাড়ি করো না, যেরূপ খ্রীষ্টানরা মারয়াম-পুত্র ঈসাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো তাঁর একজন বান্দা। অতএব, তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" (বুখারী-মুসলিম) তিনি-ﷺ-আরো বলেন,

((وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ فِي الدِّين))

"সাবধান! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থারবে। কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্বের অনেককেই ধ্বংস করে দিয়েছে।" মুসলিম শরীফে ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলু-ল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সীমা লঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।" এই কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।"

কতিপয় বিষয় জানা গেল,

১। যে ব্যক্তি এই অধ্যায় এবং এর পরবর্তী দু'টি অধ্যায়কে ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তার নিকট ইসলামের প্রাথমিক পরিস্থিতি কি ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং সে আল্লাহর কুদরত ও তাঁর দ্বারা মানুষের অন্তরের বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করবে।

২। যমীনে শির্ক প্রথমে কিভাবে শুরু হয়, তা জানা গেল। তা ছিল নেক লোকদেরকে কেন্দ্র করে।

৩। সর্ব প্রথম যে জিনিসের দ্বারা নবীদের দ্বীনের পরিবর্তন সুচিত হয়, সে সম্পর্কে ও তার কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। আর এটাও জানা গেল যে, আল্লাহই তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন।

৪। শরীয়ত ও প্রকৃতির বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিদআতকে গ্রহণ করার কারণ কি, তা জানা গেল।

৫। এর (কবুল করার) কারণই ছিল হক্ক ও না-হক্ককে একত্রে মিশ্রিত করণ। যেমন, প্রথমতঃ নেক লোকদের প্রতি ভালবাসা পোষণ। আর দ্বিতীয়তঃ আলেমদের একটি দলের এমন কিছু কাজ সম্পাদন করা, যার দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভাল ও সৎ। কিন্তু পরবর্তী লোকেরা মনে করে নেয় যে, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু।

৬। সূরা নূহের আয়াতের তাফসীর।

৭। মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস সম্পর্কে জানা গেল যে, হক্কের প্রতি টান অল্প এবং বাতিলের প্রতি ঝোঁক বেশী।

৮। যারা বলেন, বিদআত হলো কুফরীর কারণ। আর ইবলীসের নিকট পাপের থেকে বিদআত বেশী প্রিয়। কারণ, পাপ থেকে তাওবা করতে পারে, কিন্তু বিদআত থেকে তাওবা করবে না, তাঁদের কথার সমর্থনও (উক্ত হাদীস থেকে) পাওয়া যায়। (কেননা, বিদআত কাজ ভাল মনে করেই করা হয়। আর যে কাজ ভাল মনে করে করা হয় তা থেকে তওবা করার সম্ভাবনা কম)।

৯। বিদআতের পরিণাম সম্পর্কে শয়তান ভালভাবেই জানে, তাতে কর্তার উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক না কেন।

১০। শরীয়তের সীমালঙ্ঘনের নিষিদ্ধতার সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে এবং সীমালঙ্ঘনের পরিণাম সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১১। নেক কাজের উদ্দেশ্যে কবরে অবস্থান করার ক্ষতি।

১২। মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়া এবং তা মিটিয়ে দেওয়ার মধ্যে নিহিত হিকমত সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১৩। হাদীসে উল্লিখিত ঘটনার গুরুত্ব এবং সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া অনেক প্রয়োজন, যদিও মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীন।

১৪। বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বিদআতীরা উক্ত ঘটনা হাদীস ও তফসীরের কিতাবে পাঠ করে, এর অর্থও ভালভাবে বুঝে এবং আল্লাহ তাদের ও তাদের আক্বীদার মধ্যে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়ালেও তারা মনে করে যে, নূহ-عليه السلام-এর জাতির কার্যসমূহই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তা-ই হল কুফরী এবং এই কুফরী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির জান-মাল বৈধ।

১৫। এ কথাও পরিষ্কার যে প্রতিমাগুলোর নিকট তারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না।

১৬। তাদের বিশ্বাস হল, যে আলেমরা মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, তাদেরও অনুরূপ কামনা ছিল।

১৭। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণীতে রয়েছে সুমহান এই ঘোষণা, “তোমরা আমার প্রশংসায় ঐরূপ বাড়াবাড়ি করো না, যেরূপ খ্রীষ্টানরা মরীয়মের পুত্রকে নিয়ে করেছিল।” তিনি তবলীগের মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন। তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

১৮। আমাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নসীহত হল, যারা শরীয়তের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘ করবে, তারাই ধ্বংস হবে।

১৯। এখানে এ কথাও পরিষ্কার করে জানা গেল যে, প্রকৃত জ্ঞান ভুলিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের (মূর্তির) পূজা হয়নি। তাই এতে ইলম থাকার উপকারিতা এবং তা না থাকার অপকারিতার বর্ণনাও রয়েছে।
২০। জ্ঞান না থাকার কারণ হল, আলেমদের মৃত্যুবরণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

'গুলু' আরবী শব্দ। এর অর্থ হল, সীমালঙ্ঘন করা। অর্থাৎ, মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট অধিকারসমূহের কোনো কিছু নেক লোকদের প্রদান করা। কেননা, আল্লাহর যে অধিকারে কেউ অংশীদার হতে পারে না তা হল, পরিপূর্ণ হওয়া। তিনি মুখাপেক্ষীহীন এবং তিনিই সব দিক দিয়ে সব কিছুর পরিচালক। তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৃষ্টিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে এই অধিকারের কোনো কিছু প্রদান করে, সে যেন বিশ্বের প্রতিপালকের সাথে তার তুলনা করে। আর এটাই হল বড় শির্ক। আর এ কথা যেন স্মরণে থাকে যে, অধিকার হল তিন প্রকারের, (১) আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট অধিকার, তাতে কেউ অংশীদার হতে পারে না। আর তা হল, তাঁকেই উপাস্য মনে করা। কেবল তাঁরই ইবাদত করা। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁকেই ভালবাসা ও ভয় করা এবং তাঁরই নিকট আশা করা। (২) এমন অধিকার, যা নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, তাঁদের সম্মান করা এবং তাঁদের অধিকার আদায় করা। (৩) এমন অধিকার, যাতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উভয়েই শরীক। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের অনুসরণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে এগুলো আল্লাহরই অধিকার। আল্লাহর অধিকারের

ভিত্তিতেই তা রাসূলগণের অধিকার। হক্ক পন্থীরা এই অধিকারগুলোর মধ্যে পার্থক্য ভালভাবেই জানে। তাই তাঁরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করে এবং দ্বীনকে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে। অনুরূপ নবী ও ওলীদের সম্মান ও মর্যাদা অনুপাতে তাঁদেরও অধিকার আদায় করে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

কোনো নেক লোকের কবরের নিকট যদি আল্লাহর ইবাদত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়, তাহেল সেই নেক লোকের ইবাদত করা যে আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ তা সহজেই অনুমেয়।

فِي ا لصَّحِيْحِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَّمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبْشَةِ، وَمَا فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ: ((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ العَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ))

সহী হাদীসে (বুখারী ও মুসলিম শরীফে) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে হাবশায় তাঁর দেখা এক উপাসনালয় এবং তাতে রাখা মূর্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি-ﷺ-বললেন, ওরা হল এমন লোক যে, যখন তাদের কোনো নেক লোক অথবা নেক বান্দার মৃত্যু হত, তখন তারা তার কবরে মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে তাদের মূর্তি স্থাপন করত। এরা হল আল্লাহর নিকট সৃষ্টির নিকৃষ্টতম (সম্প্রদায়)।" এরা দুই ফিৎনাকে একত্রিত করেছে কবর এবং মূর্তির ফিৎনা।

وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ،

فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) يُحَذِّر ما صنعوا، لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا)) [رواه البخاري ومسلم]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে স্বীয় মুখমণ্ডল তদীয় একটি চাদর দ্বারা ঢেকে নিলেন। যখন তিনি কষ্ট অনুভব করতেন,তখন তা তাঁর মুখমণ্ডল থেকে সরিয়ে দিতেন। আর এই অবস্থায় তিনি বলতেন, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের উপর আল্লাহর লানত হোক তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।" তারা যা করেছ, তা থেকে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যদি তাঁর কবরকে মসজিদে পরিণত করার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে তাঁর কবরকে আরো উচ্চ করা হতো।

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدَب بنِ عَبْد الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: ((إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ))

মুসলিম শরীফে জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আমি আল্লাহর নিকট দায়মুক্ত ঘোষণা করছি যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কাউকে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। কেননা, আল্লাহ আমাকে

বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইব্রাহীম-ﷺ-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শোন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। কাজেই তোমরা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করবে না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করছি।” রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। তার প্রতি অভিসম্পাতও করেছেন, যে এ রকম করে। কবরে নামায পড়াও তাকে মসজিদে পরিণত করার অন্তর্ভুক্ত, যদিও মসজিদ না বানানো হয়। তিনি কবরকে মসজিদে পরিণত করার আশঙ্কা বোধ করতেন, কথার অর্থই হল, সেখানে নামায ইত্যাদি পড়া। কারণ, সাহাবারা এমন ছিলেন না যে, তাঁরা কবরে মসজিদ তৈরী করবেন। যেখানেই নামায পড়ার ইচ্ছা করা হয়, তা মসজিদ বিবেচিত হয়। অনুরূপ যেখানেই নামায পড়া হয়, সেই স্থানকে মসজিদ বলা হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, “সম্পূর্ণ যমীনকে আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছন।”

وَلأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَن ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه مرفوعا ((إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ))

ইমাম আহমদ ইবনে মাসঊদ-رضي الله عنه-থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই সব লোক, যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত উপস্থিত হবে, আর সেই সব লোক যারা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত কর।”

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। যে ব্যক্তি কোনো নেক লোকের কবরে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে আল্লহর ইবাদত করে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বক্তব্য তার উপরেও বর্তাবে, যদিও কর্তার নিয়ত সৎ হয়।

২। মূর্তির ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। এ (কবরকে মসজিদ বানানোর) ব্যাপারে কিভাবে গুরুত্বের সাথে বাধা প্রদান করেছেন, তা তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়। প্রথমে তিনি খুব জোর দিয়ে নিষেধ করেন। অতঃপর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে তার পুনরাবৃত্তি করেন। আবার সাহাবাদের সমাবেশেও তার উল্লেখ করেন।

৪। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই সেখানে কোনো কিছু করতে নিষেধ প্রদান করেছেন।

৫। কবরকে মসজিদে পরিণত করা হল, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের তরীকা।

৬। তারা এই কারণে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কর্তৃক অভিশপ্ত।

৭। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রতি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর লানত করার অর্থ হল, আমাদেরকে তাঁর কবরের ব্যাপারে সতর্ক করা।

৮। তাঁর কবরকে উঁচু না করার কারণ জানা গেল।

৯। কবরকে মসজিদে পরিণত করার অর্থ কি জানা গেল।

১০। যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে এই দুই শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এক সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি-ﷺ-শির্ক সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার পরিণাম ও তার উপকরণের উল্লেখ করে দিয়েছেন।

১১। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে খুৎবার মধ্যে সেই দুই দলের আক্বীদার খণ্ডন করেন, যারা বিদআতীদের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্টতম দল। বরং কোনো কোনো আলেমরা তো এদেরকে ৭৩ ফিরক্বার মধ্যে গণ্য করেছেন। আর ওরা হল, রাফেযা এবং জাহমিয়া। রাফেযাদের কারণেই শির্ক ও কবর পূজার জন্ম হয়। আর এরাই সর্ব প্রথম কবরে মসজিদ নির্মাণ করে।

১২। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ও মৃত্যুযন্ত্রনা অনুভব করেছেন।
১৩। তিনি-ﷺ-আল্লাহর বন্ধু হওয়ার গুণে গুণান্বিত ছিলেন।
১৪। বন্ধু হওয়ার মর্যাদা মুহাব্বাতের থেকে বেশী।
১৫। এতে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আবূ বাকার সাহাবীর মধ্যে উত্তম ছিলেন।
১৬। তাঁর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিতও এতে রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পূর্বের দুই অধ্যায়ে লেখক যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, তা থেকে নেক লোকের কবরকে কেন্দ্র করে যেসব কার্যকলাপ করা হয়, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কবরে যা কিছু করা হয়, তা দুই প্রকারের। যথা, জায়েয ও না জায়েয। জায়েয হল তা-ই, যা শরীয়ত প্রণয়নকারী প্রণয়ন করেছেন। যেমন শরীয়তী তরীকায় কবর যিয়ারত করা। তবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়। সুন্নাত অনুযায়ী মুসলিম কবরের যিয়ারত করবে। সকল কবরবাসীর জন্য সাধারণ দুআ করবে এবং নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের জন্য বিশেষ করে দুআ করবে। তাদের জন্য দুআ, ক্ষমা চাওয়া এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণের প্রার্থনা করার কারণে, সে তাদের প্রতি এবং সুন্নাতের অনুসরণ আখেরাতের স্মরণ ও কবর থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কারণে স্বীয় নাফসের প্রতিও অনুগ্রহকারী বিবেচিত হবে। আর না জায়েয হল দুই প্রকারের। যথা,
১। হারাম ও শির্কের মাধ্যম। যেমন, কবরকে স্পর্শ করা, কবরবাসীকে আল্লাহর নিকট মাধ্যম বানানো এবং সেখানে নামায পড়া। অনুরূপ কবরে বাতি জ্বালানো, তার উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা এবং কবর ও কবরবাসীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা।

২। বড় শির্ক। যেমন, কবরবাসীদের নিকট দুআ করা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা এবং তাদেরই নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজনাদির কামনা করা। অতএব এটা হল বড় শির্ক। আর এটাই হল সেই কাজ, যা মূর্তিপূজকরা তাদের মূর্তির সাথে করে। যদিও কর্তাদের এই কাজ এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, তারা তাদেরই নিকট উদ্দেশ্য অর্জনের আশা রাখে অথবা এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, তারা তাদেরকে কেবল মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে এ সবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, মুশরিকরা বলতো,

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]

"আমরা তো তাদের ইবাদত কেবল এই জন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।" (যুমার ৩) তারা এ কথাও আর বলে যে,

﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾ [يونس: ١٨]

"তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে।" (সূরা ইউনুস ১৮) কাজেই কেউ যদি মনে করে যে, কবরবাসীর নিকট প্রার্থনা করা ও তাদেরকে ইষ্টানিষ্টের মালিক মনে করা কুফরী নয়। অনুরূপ এই মনে করাও কুফরী নয় যে, প্রকৃতপক্ষে কর্তা হলেন আল্লহ, তারা কেবল আল্লহ ও তাদের নিকট যারা প্রার্থনা করে ও ফরিয়াদ করে, তাদের মাধ্যম ও অসীলা, তাহলে সে কাফের গণ্য হবে। কেননা, যে এই রূপ ধারণা পোষণ করল, সে যেন কিতাব ও সুন্নাহের আনিত বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করল। আর এ ব্যাপারে উম্মতের একমত যে, যে ব্যক্তি গায়রুল্লহর নিকট প্রার্থনা করবে, তাতে তাদেরকে মাধ্যম বানিয়ে হোক বা তাদের নিকট সরাসরি প্রার্থনা করা হোক, উভয় ক্ষেত্রেই সে মুশরিক

ও কাফের বিবেচিত হবে। আর এটা শরীয়তের এমন বিষয়, যা অতি সহজেই জানা যায়। পাঠকের উচিত বিস্তারিত এই আলোচনাকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া, যাতে তারা এই অধ্যায়ে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় -গুলোর মধ্যে পার্থক্য করে নিতে পারে। কারণ, এই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই অনেক ফিৎনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে। ফিৎনা থেকে তারাই মুক্তি পেয়েছে, যারা সত্যকে জেনে তার অনুসরণ করেছে।

নেক লোকদের কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, তাকে এমন মূর্তিতে পরিণত করে, যার পূজা করা হয়

روى مالك في الموطا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

ইমাম মালেক (রাহঃ) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, “হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না, যার পূজা করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর গযব কঠোরভাবে আপতিত হয়েছে, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।” আর ইবনে জারির সুফিয়ান থেকে, তিনি মানসুর হতে, তিনি মুজাহিদ থেকে ‘আফা রায়তুমুল উযযা’ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, ‘লাত’ একজন সৎ মানুষ ছিলেন, হাজীদেরকে ছাতু খাওয়াতেন। যখন তিনি মারা গেলেন, লোকেরা তাঁর কবর পূজতে শুরু করে দিল।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)) [رواه أهل السنن]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঐসব নারীদের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন, যারা কবরের যিয়ারত করে এবং ঐসব লোকদের উপরও, যারা কবরে মসজিদ নির্মাণ করে ও কবরে বাতি জ্বালায়।" (সুনান গ্রন্থে হাদাসটি বর্ণিত হয়েছে)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। 'আওষান'-শব্দের ব্যাখ্যা।

২। 'ইবাদত'-এর ব্যাখ্যা।

৩। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যে জিনিস সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করেছেন, সেই জিনিস থেকেই তিনি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন।

৪। তিনি-ﷺ-মূর্তি পূজা ও কবরকে মসজিদে পরিণত করাকে এক সাথে জুড়ে দিয়েছেন।

৫। এ ব্যাপারে আল্লাহর কঠোর গযবের কথা উল্লেখ হয়েছে।

৬। 'লাত'-এর পূজা কেমনে শুরু হয়েছিল, তার জ্ঞান লাভ।

৭। এই অবগতি অর্জিত হল যে, 'লাত' এক নেক লোকের কবর।

৮। ঐ কবরবাসীর নামই ছিল 'লাত' আর এই জন্যই কবরের উক্ত নামকরণ করা হয়।

৯। কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর লা'নত।

তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও শির্কের পথ বন্ধকরণে রাসূল-ﷺ-এর তৎপরতা

মহান আল্লহ বলেন,

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨]

"তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল আগমন করলেন।" (তাওবা ১২৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)) [رواه أبوداود بإسناد حسن، ورواته ثقات]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কারণ, তোমরা যেখান থেকেই দরূদ পাঠ করবে, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হবে।" (আবূ দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের বর্ণনাকারীরা সকলেই নির্ভরযোগ্য)

আলী ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কবরের পার্শ্বস্থ এক খোলা জায়গায় প্রবেশ ক'রে দুআ করছেন। তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাবো না, যা আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং আমার পিতা আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে মেলায় পরিণত করো না এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে দিও না। তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।" (মুখতারা)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। সূরা বারাআর আয়াতের তফসীর।

২। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর উম্মতকে শির্কের সীমা থেকে অনেক দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

৩। তিনি-ﷺ-আমাদের প্রতি খুবই দয়াবান ও মেহেরবান ছিলেন এবং আমাদের হেদায়াতের প্রতি ছিলেন চরম আগ্রহী।

৪। কবর যিয়ারত উত্তম কাজ হলেও নির্দিষ্ট নিয়মে তা নিষেধ।

৫। খুব বেশী যিয়ারত করা নিষেধ।

৬। ঘরে নফল নামায পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৭। সাহাবাদের নিকট এ কথা সাব্যস্ত ছিলো যে, কবরে নামায পড়া যায় না।

৮। দরূদ ও সালামের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বক্তব্য হল, যে, মানুষের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে যায়, তাতে সে যত দূরেই থাকুক না কেন, এর জন্য নিকটে আসার কোনো দরকান নেই।

৯। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে তাঁর বারযাখী জীবনে উম্মতের আমল তথা দরূদ ও সালাম পৌঁছে দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যে ব্যক্তি এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসগুলোকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, সে লক্ষ্য করবে যে, এগুলো এমন জিনিস অবলম্বনের উপর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে, যার দ্বারা তাওহীদ বলিষ্ঠ হবে ও বৃদ্ধি পাবে। যেমন, আল্লাহর দিকেই ফিরে আসা, আশা ও ভয়সহ তাঁরই উপর আস্থা রাখা, তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া লাভের দৃঢ় আশা রাখা এবং এর জন্য প্রচেষ্টা করা। সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা এবং কোনো অবস্থাতেই তাদের উপর ভরসা না করা, অথবা তাদের কাউকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় আমলকে পূর্ণরূপে আদায় করা। বিশেষ করে ইবাদতের যেটা রূহ বা প্রাণ, তার উপর উদ্বুদ্ধ করেছে। আর তা হল, কেবল আল্লাহরই জন্য নিষ্ঠাবান হওয়া। অতঃপর এমন

কথা ও কাজ থেকে নিষেধ প্রদান করেছে, যাতে সৃষ্টিদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকেও নিষেধ করেছে। কারণ, এটা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার আহ্বান জানায়। অনুরূপ এমন কথা ও কাজ থেকে নিষেধ করেছে, যা শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পাড়ে বলে আশঙ্কা করা হয়। আর এ সবই হচ্ছে তাওহীদের হিফাযতের জন্য। শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন সকল মাধ্যম থেকেও বাধা দান করেছে। এই সকল বাধা ও নিষেধাজ্ঞা মু'মিনদের প্রতি রহমস্বরূপ আরোপিত হয়েছে। যাতে তারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত পূর্ণরূপে আদায় করতে সক্ষম হয়, যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়।

এই উম্মতের অনেকেই মূর্তিরপূজা করবে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء:٥١]

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিবত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগূত (বাতিল উপাস্যে) বিশ্বাস করে।" (সূরা নিসা ৫১) তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة:٦٠]

"বল, আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি

তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের ও তাগুতের ইবাদত করেছে।" (সূরা মায়েদা ৬০) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً﴾ [الكهف: ٢١]

"তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।" (সূরা কাহফ ২১)

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ((فَمَنْ)) [أخرجاه]

আবূ সাঈদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্বের জাতির ভ্রান্ত নীতির পূর্ণ অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান? তিনি বললেন, তারা ছাড়া আবার কে?" (বুখারী-মুসলিম)

ولمسلم عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ أَنَّ رَسُولُ اللهِ-ﷺ- قَالَ: ((إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ

أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا))

মুসলিম শরীফে সোবান-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহ আমার জন্য যমীনকে একত্রিত করে দিলেন। তখন আমি তার পশ্চিম ও পূর্ব পর্যন্ত দেখলাম। আর আমার উম্মতের রাজত্ব ঐ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে, যতদূর পর্যন্ত আমার জন্য একত্রিত করা হয়েছে। আর আমি লাল শুভ্র বর্ণের দু'টি ধন-ভাণ্ডার লাভ করলাম। আর আমার প্রতিপালকের নিকট চাইলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করেন এবং বাইরের এমন শত্রু যেন তাদের উপর চাপিয়ে না দেন, যারা তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে। আমার প্রতিপালক বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোনো বিষয়ের ফয়সালা করে নেই, তখন তা আর রদ্দ হয় না। আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমার প্রার্থনা কবুল করলাম যে, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস করবো না। আর বাইরের এমন কোনো শত্রুকে তাদের উপর চাপিয়ে দিবো না, যারা তাদের সম্পদ লুটে খাবে, যদিও বিশ্ববাসী তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত-ভাবে ওঠেপড়ে লাগে। অবশ্য তারা আপসে একে অপরকে হত্যা করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে।"

এই হাদীসটি হাফেয বুরক্বানী তাঁর সহী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিম্নের বাক্যগুলো বৃদ্ধি করেছেন,

وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَاوَقَعَ السَّيْفُ عَلَيْهِمْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ،

وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ)) [رواه أبوداود]

"আমি আমার উম্মতের উপর ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আশঙ্কা বোধ করছি। তাদের উপর একবার তরবারী নেমে এলে, কিয়ামত পর্যন্ত তা আর খাপবদ্ধ হবে না। আর যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি দল মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি দল মূর্তি পূজায় লিপ্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। আর আমার উম্মত থেকে ৩০জন এমন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সকলেই নিজেকে নবী মনে করবে। অথচ আমি শেষ নবী। আমার পর কোনো নবী নেই। আর আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর বিজয় থাকবে। তাদের কেউ অনিষ্ঠ করতে চাইলে, তা করতে পারবে না, এমনকি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এসে পৌঁছবে।"

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। সূরা নিসার আয়াতের তাফসীর।
২। সূরা মায়েদার আয়াতের তাফসীর।
৩। সূরা কাহফের আয়াতের তাফসীর।
৪। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 'জিবত' ও 'তাগুত'-এর উপর ঈমান আনার অর্থ কি? তার অর্থ কি অন্তরের বিশ্বাস, নাকি তাদের প্রতি ঈমান পোষণকারী-দেরকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও আমলে তাদের শরীক ও সহায়ক থাকা?
৫। কাফেরদের কুফরী সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও মুশরিকরা মনে করে যে, তারা মু'মিনদের থেকে বেশী সঠিক পথে প্রতিষ্ঠত।

৬। এই উম্মতের মধ্যেও এমন লোক অবশ্যই পাওয়া যাবে, যার উল্লেখ আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত হাদীসে হয়েছে।

৭। এই উম্মতের অনেক সমাজে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হবে।

৮। এই উম্মত থেকে এমন লোকের অবির্ভাব ঘটবে, যে নবী হওয়ার দাবী করবে। যেমন মুখতার নামক এক ব্যক্তি করেছিল। সে কালেমার পাঠক ছিল। বিশ্বাস করত রাসূল সত্য এবং কুরআনও সত্য। কুরআনে আছে যে, মুহাম্মাদ শেষ নবী। সাহাবীদের শেষ যুগে মুখতারের আবির্ভাব ঘটে ছিল। আবার অনেকেই তার অনুসরণ করেছিল।

৯। এটা একটি সুখবর যে, সত্য একেবারে শেষ হয়ে যাবে না, বরং এর উপর একটি দল কায়েম থাকবে।

১০। আহলে হক্কের সব থেকে বড় নিদর্শন হল, তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও, তাঁদের দুর্নামকারীরা ও তাঁদের বিরোধিতাকারীরা তাঁদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

১১। আহলে হক্কদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

১২। (হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর) বড় বড় কিছু নিদর্শন প্রমাণিত হয়। যেমন, আল্লাহর তাঁর জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের যমীনকে একত্রিত করে দেওয়া। তিনি যেভাবে খবর দিয়েছেন, সেইভাবেই তা সংঘটিত হওয়া। তিনি খবর দিয়েছেন যে, তাঁকে দু'টি ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে। তিনি খবর দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাঁর উম্মতের ব্যাপারে দু'টি প্রার্থনা কবুল করেছেন। তিনি খবর দিয়েছেন যে, তাঁর তৃতীয় প্রার্থনা গৃহীত হয়নি। তিনি খবর দিয়েছেন যে, (উম্মতের উপর) তরবারী নেমে এলে, কিয়ামত পর্যন্ত তা উঠবে না। তিনি খবর দিয়েছেন যে, মানুষরা আপসে একে অপরকে হত্যা করবে এবং বন্দী করবে। তিনি উম্মতের মধ্যে ভ্রান্ত

নেতাদের আবির্ভাবের আশঙ্কা বোধ করেছেন। তিনি এ খবরও দিয়েছেন যে, এই উম্মতে নবূওয়াতের দাবীদারের আবির্ভাব ঘটবে। তিনি এ খবরও দিয়েছেন যে, একদল লোক সত্যের উপর কায়েম থাকবে। এই সব ব্যাপার জ্ঞানের বহির্ভূত হলেও, তিনি যেভাবে খবর দিয়েছেন, সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

১৩। রাসূলুল্লাহ-ﷺ- শুধু ভ্রান্ত নেতাদের আশঙ্কা বোধ করেছেন।

১৪। তিনি-ﷺ-মূর্তিপূজার অর্থ সম্পর্কে অবহিত করিয়েছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল, শির্কের ব্যাপারে সতর্ক করা ও ভয় দেখানো এবং এ কথা পরিষ্কার করে দেওয়া যে, এই উম্মতের মধ্যে এটা অতি বাস্তব বিষয়। আর এতে সেই ব্যক্তির ধারণার খণ্ডন করা হয়েছে, যে মনে করে যে, 'লা-ইলাহা ইল্লা ল্লাহ' পাঠকারী ইসলামের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যদিও সে তাওহীদ বিরোধী কোনো কাজ করে। যেমন, কবরবাসীদের নিকট দুআ ও ফরিয়াদ করা। তার এই ধারণাও বাতিল যে, এটা অসীলা, ইবাদত নয়। কারণ, আরবী শব্দ 'আল-অষান' সেই সমস্ত উপাস্যদের বলা হয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয়। তাতে তা বৃক্ষাদি, পাথর ও কোনো ইমারত হোক বা তারা আম্বিয়া এবং সৎ ও অসৎ লোকদের যে কেউ হোক না কেন, এখানে এ সবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, ইবাদত হল একমাত্র আল্লাহর অধিকার। সুতরাং যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে আহ্বান করবে অথবা তার ইবাদত করবে, সে তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণকারী বিবেচিত হবে এবং এরই জন্য সে ইসলাম বহির্ভূত গণ্য হবে। তার নিজেকে ইসলামের সাথে

সম্পর্কিত করা কোনো উপকারে আসবে না। বহু মুশরিক, ধর্মদ্রোহী এবং কাফের ও মুনাফেক নিজেকে মুসলিম মনে করেছে। (কিন্তু তারা কেউ প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ছিল না) দ্বীনের বিধি-বিধানের উপর কায়েম থাকাই হল আসল লক্ষণীয়, নাম ও মৌখিক স্বীকৃতির কোনো মূল্য নেই।

যাদু প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة:١٠٢]

“তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই।” (সূরা বাক্বারা ১০২) তিনি আরো বলেন,

﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء:٥٠]

“তারা প্রতিমা ও শয়তানের উপর আস্থা রাখে।” (সূরা নিসা ৫১)

উমার-ﷺ-বলেন, ‘জিবত’ বলতে যাদু বুঝায়। আর ‘তাগুত’ বলতে শয়তান বুঝায়। জাবির-ﷺ-বলেন, ‘তাওয়াগীত’ বলতে ঐ সব গণক, যাদের উপর শয়তান অবতরণ করে থাকে। প্রত্যেক গোত্রে একজন করে থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) [رواه البخاري ومسلم]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “ধ্বংসকারী

সাতটি জিনিস থেকে বাঁচ।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু, কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা।" (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعاً: ((حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ)) [رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف]

জুন্দুব-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে, যাদুকরের শাস্তি হল, তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করা। (ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সঠিক কথা হল, হাদীসটি মাওকুফ।

وَفِي صَحِيْحِ الْبُخَارِي عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ: أَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَ سَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِر))

সহী বুখারীতে বাজালা ইবনে আবদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-এই মর্মে লিখিত নির্দেশ জারী করেন যে, তোমরা প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা কর। তাতে পুরুষ হোক বা মহিলা। ফলে আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করি।

সহী সূত্রে হাফসা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর একজন দাসী তাঁকে যাদু করলে, তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ফলে তাকে হত্যা করা হয়। অনুরূপ জুন্দুব থেকে সহী সূত্রে বর্ণিত, ইমাম আহমদ বলেন, তিনজন সাহাবী থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। সূরা বাক্বারার আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা নিসার আয়াতের তাফসীর।

৩। ‘জিবত’ ও ‘তাগুত’ এর ব্যাখ্যা এবং উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য।

৪। ‘তাগুত’ জ্বিনদের মধ্যে থেকেও হতে পারে, আবার মানুষদের মধ্যে থেকেও হতে পারে।

৫। নিষিদ্ধ সাতটি সর্বনাশী বস্তু সম্পর্কে জানা গেল।

৬। যাদুকর কাফের।

৭। তাকে হত্যা করা হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে না।

৮। উমার-ﷺ-এর যুগে যদি যাদুকর থেকে থাকে, তাহলে তাঁর পরের যুগে থাকা তো স্বাভাবিকই।

যাদুর কয়েকটি প্রকার

ইমাম আহমদ (রাহঃ) বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে জা’ফার হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে আউফ হায়্যান ইবনে আ’লা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ক্বুতন ইবনে ক্বাবীসা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الجِبْتِ))

“নিশ্চয় ‘ইয়াফা’ এবং ‘তারকা’ ও ‘তিয়ারাহ’ যাদুর অন্তর্ভুক্ত।” আউফ বলেন, ‘ইয়াফা’ হল পাখী তাড়া করা। আর ‘তারকা’ হল, সেই দাগ, যা যমীনে আঁকা হয়। ‘জিবত’ সম্পর্কে হাসান বলেন, তা হল শয়তানের তন্ত্র-মন্ত্র।

((مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ)) [رواه أبوداود، إسناده صحيح]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা থেকে কিছু শিক্ষা করল, সে যাদু থেকে কিছু শিক্ষা করল। যত বেশী সে ঐ বিদ্যা শিখবে, তত বেশী তার পাপ বর্ধিত হবে।" (আবূ দাউদ) এই হাদীসের সনদ সহীহ। নাসায়ী শরীফে ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, ((যে ব্যক্তি কোনো কিছুতে গিরে লাগিয়ে তাতে ফুঁক দেয়, সে যাদু করে। আর যে যাদু করে, সে শির্ক করে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলায়, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়)।

عَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ)) [رواه مسلم]

ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, অতি জঘন্যতম হারাম অশ্লীলতা সম্পর্কে কি আমি তোমাদেরকে বলে দিবো না? তা হল চুগলী করা। মানুষের মাঝে কথা ছড়ানো।" (মুসলিম)

وَلَهُمَا عَن ابْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً))

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অবশ্যই কোনো কোনো বক্তব্যে যাদু থাকে।" (অর্থাৎ, অন্তরে যাদুর মত প্রভাব সৃষ্টি করে)

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। 'ইয়াফা, তারক্কা' এবং 'তিয়ারা' যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

২। উল্লিখিত জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা।

৩। জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করা যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৪। গিরেতে ফুঁক দেওয়াও যাদুর আওতাভুক্ত।

৫। চুগলী করাও এক প্রকার যাদু।

৬। অলংকার পূর্ণ অনেক কথাও যাদুর আওতায় পড়ে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তাওহীদের অধ্যায়ে যাদুর প্রসঙ্গ নিয়ে আসার কারণ হল, বহু প্রকারের যাদু এমনও রয়েছে, যা শির্ক ও খবীস আত্মার মাধ্যম গ্রহণ ব্যতীত যাদুকর তার লক্ষ্যে সফলকাম হয় না। সুতরাং বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পাক্কা তাওহীদবাদী হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে অল্প-বেশী সমস্ত রকমের যাদু ত্যাগ করবে। আর এরই কারণে বিধানদাতা যাদুকে শির্কের সাথে সংযুক্ত করেছেন। যাদু দুই দিক দিয়ে শির্কের আওতায় পড়ে। এক দিক হল, এতে শয়তানকে কাজে লাগানো হয়। তাদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করতে হয়। আবার অনেক সময় তাদের খেদমত নেওয়ার জন্যে ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের নিকট যা পছন্দনীয় তার নজরানা পেশ করতে হয়। আর দ্বিতীয় দিক হল, এতে অদৃশ্য জ্ঞানের এবং আল্লাহর জ্ঞানে শরীক হওয়ার দাবী করা হয়। আর যাদুর জন্য এমন নিয়ম-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যা শির্ক ও কুফরীর আওতাভুক্ত। অনুরূপ এতে রয়েছে অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং জঘন্য কার্যকলাপ। যেমন, দুই ব্যক্তি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রেম-প্রীতি নষ্ট করা, কাউকে কারো থেকে বিমুখ করা। আবার কাউকে কারো প্রতি আকৃষ্ট করা এবং বিবেক-বুদ্ধির বিকৃতি ঘটানোর প্রচেষ্টা করা। আর এগুলো হল, জঘন্যতম হারাম জিনিস। কেননা, এগুলো

শির্ক ও তার উপকরণের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু যাদুকর অত্যধিক অনিষ্টকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, তাই তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক।

চুগলী করাও যাদুর অন্তর্ভুক্ত জিনিস, যা মানুষের মধ্যে প্রচলিত স্বভাব। কারণ, তারাও যাদুতে অংশ গ্রহণ করে। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত দুই ব্যক্তির অন্তরকে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদের অন্তরে মন্দ জিনিস ভরে দেয়। কাজেই যাদু হল অনেক প্রকারের ও বহু ধরনের। এর কোনো কোনো প্রকার অন্য প্রকারের থেকেও জঘন্য ও নিকৃষ্ট।

দৈবজ্ঞ ইত্যাদি প্রসঙ্গে

روى مسلم في صحيحه عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً)

ইমাম মুসলিম তাঁর সহী গ্রন্থে নবী করীম-ﷺ-এর কোনো কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণক তথা গায়েব জানার দাবীদারের নিকট এসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না।"

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ))

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী গণ্য হয়, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" (আবূ দাউদ)

وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة، ((مَنْ أَتَـى عَرَّافاً أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ))

সুনানে আরবা ও হাকিমেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মুতাবেক। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, "যে ব্যক্তি গায়েব জানার দাবীদারের নিকট অথবা গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী গণ্য হয়, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" আবূ ইয়া'লা ভাল সনদে ইবনে মাসঊদ থেকে মাওকুফ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوْعاً: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَأَوْ تُطِيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّـنَ أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَـرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ))

ইমরান ইবনে হুসাইন-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে পাখী তাড়া ক'রে ভাগ্য নির্ণয় করে অথবা যার জন্য পাখী তাড়ানো হয় কিংবা যে গণক হয় বা যার জন্য গণনা করা হয় অথবা যে যাদু করে কিংবা যার জন্য যাদু করা হয়। আর যে গণকের নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে ঐ জিনিসের অস্বীকারকারী গণ্য হয়, যা মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।" (বাযযার)

ইমাম বাগবী বলেন, 'আররাফ' হল ঐ ব্যক্তি, যে দাবী করে যে, সে বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে অনেক কিছু সম্পর্কে অবহিত আছে। চোরাই

মাল ও তার স্থান সম্পর্কেও সে বলতে পারে। আবার কেউ কেউ বলে, ‘আররাফ’ হল ‘কাহেন’ এর অপর নাম। আর কাহেন হল ঐ ব্যক্তি, যে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের দাবী করে। আবার কেউ কেউ বলে, ‘কাহেন’ হল ঐ ব্যক্তি, যে অন্তরের খবর বলে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন, ‘আররাফ’ হল, গণৎকার, জ্যোতিষী এবং রাম্মাল ইত্যাদির অপর নাম, যারা নিজেদের বিশেষ নিয়মের ভিত্তিতে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে। আর যারা ‘আবযাদ’ অক্ষরগুলো লিখে তারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোনো কিছুর দাবী করে, তাদের সম্পর্কে ইবনে আব্বাস-ﷺ-বলেন, আমি মনে করি যারা এরূপ করে, তাদের আখেরাতে কোনো অংশ নেই।

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। কুরআনের প্রতি বিশ্বাস, আর গণকের কথার সত্যায়ন, এই জিনিস দু’টি একত্রে জমা হতে পারে না।

২। গণৎকারের কথার সত্যায়ন করা কুফরী কাজ।

৩। যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।

৪। পাখী তাড়িয়ে যার জন্য ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়, তার উল্লেখ।

৫। যার জন্য যাদু করা হয়, তার উল্লেখ।

৬। ‘আবজাদ’ অক্ষরগুলো যে শিখে, তার উল্লেখ।

৭। ‘কাহেন’ ও ‘আররাফ’ এর মধ্যে পার্থক্য কি তার উল্লেখ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায় গণৎকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে। যারা বিভিন্ন কলা-কৌশলের মাধ্যমে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে, তাদের প্রসঙ্গে। গায়েবের ইলম এক

ও এককভাবে কেবল মহান আল্লাহই রাখেন। কাজেই যে ব্যক্তি গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করবে অথবা যে দাবী করে, তার সত্যায়ন করে, সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে অন্যকে অংশীদার স্থাপনকারী বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যুক সাব্যস্ত -কারী গণ্য হবে। গণনা সংক্রান্ত বহু শয়তানী কার্যকলাপ না তো শির্ক থেকে মুক্ত, আর না এমন মাধ্যম অবলম্বন করা থেকে মুক্ত, যার দ্বারা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করার উপর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। তাই তা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে শরীক হওয়ার দাবী করার কারণে এবং গায়রুল্লাহর নৈকট্য কামনা করার কারণে শির্ক গণ্য হবে। আল্লাহ সৃষ্টিকে এখানে এমন কুসংস্কার থেকে দূরে রেখেছেন, যা তার দ্বীন ও বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়।

যাদুর প্রতিরোধ যাদু প্রসঙ্গে

عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ: فَقَالَ: ((هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُوْدَاودَ. وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি পলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে যাদু প্রতিরোধ যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, “এ তো শয়তানের কাজ (আহমদ ও আবূ দাউদ) ইমাম আবূ দাউদ বলেন, ইমাম আহমদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, ইবনে মাসঊদ এসবই অপছন্দ করেন।

বুখারী শরীফে ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি ইবনে মুসাইয়িবকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ব্যক্তির রোগ হয়েছে, অথবা তাকে

তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, এই অবস্থায় তার জন্য দুআ-তাবীয অথবা যাদু প্রতিরোধক যাদু করা যায় কি না? তিনি বললেন, এতে কোনো দোষ নেই। কারণ, তারা এর দ্বারা সংশোধন করতে চায়। যা লাভজনক তা নিষিদ্ধ নয়।

হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাদুকর ব্যতীত যাদুকে কেউ হালাল মনে করে না।

ইবনুল কাইয়ুম বলেন, যাদুকৃত ব্যক্তি হতে যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য যে যাদু প্রয়োগ করা হয়, তাকে 'নাশরা' বলে। আর এটা দুই প্রকারের। (১) যাদুর দ্বারা যাদু দূর করা। এটাই হল শয়তানের কাজ। আর এটাই হল ইমাম হাসানের বক্তব্যের অর্থ। যাদু প্রতিরোধক যাদু প্রয়োগকারী এবং যাকে যাদু করা হয়েছে উভয়েই শয়তানের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এমন কাজ করে, যাতে শয়তান খুশী হয়ে যাদুকৃত ব্যক্তি থেকে তার যাদু উঠিয়ে নেয়। (২) ঝাড়-ফুঁক এবং বৈধ ঔষধ ও দুআ দ্বারা যাদু দূর করা, এটা জায়েয।

যে বিষয় জানা গেল

১। যাদুর দ্বারা যাদু দূর করা নিষেধ।

২। যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য বৈধ ও অবৈধ উভয় তরীকার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

'আন্নাশরা' শব্দের অর্থ হল, যাদুকৃত ব্যক্তি থেকে যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর করা। লেখক এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কায়্যুমের উক্তিকে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। তাতে জায়েয ও নাজায়েয উভয় তরীকার উল্লেখ করেছেন। আর এটাই যথেষ্ট।

অলক্ষী-কুলক্ষণ প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:١٣١]

"শোন! তাদের অশুভ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশরা তা জানে না।" (সূরা আ'রাফ ১৩১) তিনি আরো বলেন,

﴿ قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ [يس: ١٩]

"রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই।" (সূরা ইয়াসীন ১৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ)) [أخرجاه]

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সংক্রামক ব্যাধি, অলক্ষণ-কুলক্ষী, পেঁচার কুপ্রভাব এবং উদরাময়ের আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।" (বুখারী-মুসলিম) ইমাম মুসলিম একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয় না এবং ভুত-প্রেত বলতে কিছুই নেই।"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ، قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: ((كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ))

বুখারী-মুসলিমে আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সংক্রামক কোনো ব্যাধি এবং অলক্ষণ-কুলক্ষী বলতে

কিছুই নেই। তবে ‘ফাল’ আমাকে ভাল লাগে।” সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ফাল’ কি? তিনি বললেন, “উত্তম বাক্য।”

ولأبي داود بسند صحيح، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ))

ইমাম আবূ দাউদ সহী সনদে উক্বা ইবনে আমের-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকটে কুলক্ষীর কথা উল্লেখ করলে, তিনি বলেন, “তার মধ্যে উত্তম হল, ফালবা ভাল আশা করা। অলক্ষণ-কুলক্ষী কোনো মুসলিমকে তার কাজ থেকে ফিরাতে পারে না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখে তাহলে সে যেন বলে, ‘আল্লাহুম্মা লা ইয়াতী বিল হাসানা-তি ইল্লাআন্তা অলা-ইয়াদফাউস সাইয়ে আতি ইল্লা-আন্তা অলা-হাউলা অলা-ক্কুওয়াতা ইল্লা-বিকা’ “হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ বয়ে আনে না। তুমি ব্যতীত কেউ অকল্যাণ দূর করতে পারে না। তুমি ছাড়া ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তিও কারো নেই)।”

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوْعاً: ((الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا... وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ))

আবূ দাউদেই ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, অলক্ষণ-কুলক্ষী মনে করা শির্ক। অলক্ষণ-কুলক্ষী মনে করা শির্ক। এই রকম

মনে করা আমাদের আক্বীদা নয়। এ রকম কারো মনে উদয় হলে, সে যেন আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে। এই পূর্ণ আস্থার মাধ্যমে আল্লাহা তার সব দুর্ভাবনা দূর করে দিবেন।

ولأحمد من حديث ابن عمر ((مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ((أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ))

ইমাম আহমদ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যাকে তার অলক্ষণ-কুলক্ষী ধারণা কোনো কাজ থেকে ফিরিয়ে দিল, সে শির্ক করল। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার কাফফারা কি হবে? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, “সে বলবে, ‘আল্লা-হুম্মা লাখায়রা ইল্লা-খায়রুক, অলা ত্বায়রা ইল্লা-ত্বায়রুক, অ লা-ইলাহা গায়রুক” (হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে কল্যাণ ব্যতীত আর কোনো কল্যাণ নেই। তোমার পক্ষ থেকে দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কোনো দুর্ভাগ্য নেই এবং তুমি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই।

وله من حديث الفضل بن العباس: ((إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ))

ফাযল ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, “অলক্ষণ-কুলক্ষী হল, যা তোমাকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করে অথবা কোনো কাজ থেকে ফিরিয়ে দেয়।”

যে বিষয়গুলো জানা গেল

১। সূরা আ’রাফ ও সূরা ইয়াসীনের আয়াত দু’টির উপর সতর্কতা প্রদর্শন।

২। সংক্রামক ব্যাধির অস্বীকৃতি।
৩। অলক্ষ্মী-কুলক্ষ্মণের অস্বীকৃতি।
৪। পেঁচার ডাককে অলক্ষ্মণ মনে করার অস্বীকৃতি
৫। উদরাময়ের আশঙ্কার অস্বীকৃতি।
৬। ভাল আশা করা মুস্তাহাব জিনিস।
৭। 'ফাল'এর তাফসীর।
৮। অলক্ষ্মী-কুলক্ষ্মণ না ভাবা সত্ত্বেও যদি অন্তরে এই ধরনের খেয়াল জেগে উঠে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই বরং আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থার দরুণ তা দূর হয়ে যায়।
৯। যদি কারো অন্তরে অলক্ষ্মীর খেয়াল চলে আসে, তাহলে সে যেন অধ্যায়ে উল্লিখিত দুআটি পড়ে নেয়।
১০। এ কথা পরিষ্কার যে, অলক্ষ্মী মনে করা শির্ক।
১১। নিন্দনীয় অলক্ষ্মীর ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

অলক্ষ্মী বা কুলক্ষ্মণ মনে করার অর্থ হল, পাখী, নাম, কথা-বার্তা এবং পবিত্র কোনো স্থান ইত্যাদির মাধ্যমে শুভাশুভ নির্ণয় করা। শরীয়ত প্রণেতা এটা নিষেধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এরকম ধারণা যারা পোষণ করে, তাদের নিন্দা করেছেন। তবে শুভ কামনা পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অলক্ষ্মী-কুলক্ষ্মণ মনে করা অপছন্দনীয়। আর এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য হল, ভালো আশা করা মানুষের আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত নয় এবং এতে গায়রুল্লাহর সাথে আন্তরিক কোনো আস্থাও রাখা হয় না। বরং এতে কেবল উদ্দেশ্য হয়, আনন্দ ও সন্তোষ অর্জন এবং উপকারী জিনিস অর্জনের উপর আন্তরিক বলিষ্ঠতা। এর পদ্ধতি হল, কোনো বান্দা সফরে যাওয়ার

অথবা বিবাহ করার কিংবা কোনো চুক্তি করারবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করল। অতঃপর সে এ ব্যাপারে এমন কিছু দেখল, যা তাকে আনন্দ দেয় বা এমন কথা-বার্তা শুনলো, যা তাকে তৃপ্তি দেয়। ফলে তার মনে ভাল আশার জন্ম হল এবং যে কাজের সে পরিকল্পনা করেছিল, তা সম্পাদন করার প্রতি তার উদ্যম আরো বেড়ে গেল। এ সবই ভাল এবং এর পরিণামই উত্তম। এতে নিষেধ বলতে কোনো কিছু নেই। আর অলক্ষী বা কুলক্ষণ হল এই যে, কোনো বান্দা দ্বীন অথবা দুনিয়ার লাভদায়ক কার্যকলাপের কোনো কিছু করার পরিকল্পনা করল। অতঃপর সে অপছন্দনীয় এমন কিছু দেখল বা শুনল, যাতে তার অন্তরে দু’টি জিনিসের কোনো একটির প্রভাব পড়ল। যার একটি অন্যটির থেকে ভয়াবহ।

১। হয় সে এই অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখার বা শুনার কারণে কৃত পরিকল্পনা ত্যাগ করবে, অর্থাৎ, এটাকে অশুভ মনে করে সেই কাজ করা থেকে সে ফিরে আসবে, যা করার সে পরিকল্পনা করেছিল। এই ক্ষেত্রে সে তার অন্তরকে এই অপছন্দনীয় জিনিসের সাথে শক্তভাবে জড়িতকারী ও সেই অনুযায়ী আমলকারী বিবেচিত হবে। কারণ, এই জিনিসই তাকে তার ইচ্ছা-ইরাদা এবং কাজ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এতে তার ঈমানের উপর প্রভাব পড়বে এবং তার তাওহীদ ও আল্লাহর উপর আস্থা হ্রাস পাবে। অতঃপর এই জিনিসই তার অন্তরকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে দিবে। তার অন্তরে সৃষ্টির ভয় ভরে দিবে। তাকে এমন মাধ্যম ও উপকরণের উপর আস্থাশীল বানাবে, যা মাধ্যম ও উপকরণই নয় এবং তার অন্তরকে আল্লাহ থেকে ছিন্ন ক’রে অন্য দিগে ফিরিয়ে দিবে। আর এটাই হল, তাওহীদকে

দুর্বল করে এবং তা শির্ক ও তার মাধ্যম এবং বুদ্ধি ও বিবেককে বিনষ্টকারী কুসংস্কারের প্রবেশ পথ।

২। আর না হয় সে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখে বা শুনে তার পরিকল্পনা ত্যাগ করবে না। কিন্তু মনে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং বিষাদ ভাব রয়ে যাবে। এটা যদিও প্রথমটার মত নয়, তবুও এতে বান্দার জন্য ক্ষতি ও অনিষ্ট রয়েছে। আর এটাও বান্দার অন্তরকে এবং আল্লাহর প্রতি তার আস্থাকে দুর্বল করে। তাছাড়া কোনো অপছন্দনীয় জিনিসের সম্মুখীন হলে ভাবতে পারে যে, এটা ঐ কারণেই হয়েছে। ফলে তার অলক্ষী বা কুলক্ষণ মনে করার মধ্যে বলিষ্ঠতা আসবে এবং ধীরে ধীরে সে প্রথমটার মধ্যে প্রবেশ করে যাবে (অর্থাৎ, কৃত পরিকল্পনা ত্যাগ করবে)।

উক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরীয়ত প্রণেতার অলক্ষী বা কুলক্ষণ মনে করাকে অপছন্দ করার ও তার নিন্দা করার কারণ কি এবং এটা তাওহীদ ও আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী কেন, সে কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তার অন্তরে এই ধরনের কোনো কিছু অনুভব করে, তার উচিত অন্তর থেকে তা দূর করার প্রচেষ্টা করা এবং এর জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা। আর অনুভূত অনিষ্টকে দূর করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

জ্যোতিষ বিদ্যা প্রসঙ্গে

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহী গ্রন্থে ক্বাতাদার সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ এই তারাগুলোকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যথা, (১) আসমনের শোভা। (২) শয়তানকে মেরে তাড়ানোর অস্ত্র (৩) পথিকদের দিগদর্শনের মাধ্যম। এই তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতীত

কেউ যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য স্থির করে, তাহলে সে ভুল করবে এবং এমন বিষয় নিজের উপর চাপিয়ে নিবে, যার সে জ্ঞান রাখে না।

ক্বাতাদাহ (রহঃ) চাঁদের কক্ষপথগুলোর জ্ঞানার্জন অপছন্দ করেছেন। ইবনে উয়ায়নাও এই জ্ঞানের অনুমতি দেন নাই। হারব উভয়ের পক্ষ থেকে এ কথার উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম আহমদ এবং ইসহাক এই জ্ঞানার্জনের অনুমতি দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ ﷺ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ)) [رواه أحمد و ابن حبان في صحيحه]

আবূ মূসা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মদপানে আসক্ত, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যাদুর সত্যায়নকারী।" (আহমদ ও ইবনে হিব্বান) (এখানে যাদু বলতে জ্যোতিষ বিদ্যা বুঝানো হয়েছে)।

যে বিষয়গুলো জানা গেল,

১। তারকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য।
২। উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত যে অন্য কিছু মনে করে, তার খণ্ডনকরণ।
৩। চাঁদের কক্ষপথের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।
৪। জ্যোতিষ বিদ্যার সত্যায়নকারীর কঠিন শাস্তি, যদিও সে মনে করে যে এটা বাতিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জ্যোতিষ বিদ্যা দুই প্রকারের। যথা,

১। ফলিতজ্যোতিষ (Astrology) অর্থাৎ, গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয়পূর্বক মানুষের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিচারবিদ্যা। এটা বাতিল ও অবৈধ। কারণ,

এতে সেই অদৃশ্য জ্ঞানে আল্লাহর শরীক হওয়ার দাবী করা হয়, যা কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। অথবা যে এই জ্ঞানের দাবী করে, তার সত্যায়ন করা হয়। কাজেই এই বাতিল দাবী এবং গায়রুল্লাহর উপর আন্তরিক আস্থা রাখার কারণে এটা তাওহীদ পরিপন্থী ও বুদ্ধিহীনকারী জিনিস। কেননা, যাবতীয় বাতিল তরীকা-পদ্ধতি ও তার সত্যায়ন করা হল জ্ঞান ও দ্বীন বিনষ্টকারী জিনিস।

২। গ্রহনক্ষত্রাদি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র (Astronomy)। অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজির অবস্থান নির্ণয়পূর্বক ক্বেবলা, সময় এবং দিগ নির্ণয় করা। এটা কোনো দোষের জিনিস নয়। বরং যদি তা ইবাদতের সময় জানার অথবা দিগ নির্ণয়ের মাধ্যম হয়, তাহলে এই ধরনের বহু উপকারী জ্ঞানার্জনের উপর শরীয়ত উদ্বুদ্ধ করেছে। সুতরাং এই উভয় বিদ্যার মধ্যে কোনোটা বৈধ ও কোনোটা অবৈধ, তার পার্থক্য সুচিত করা ওয়াজিব। প্রথম বিদ্যাটা হল তাওহীদ পরিপন্থী। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টা তাওহীদ পরিপন্থী নয়।

তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة:٨٢]

“আর তোমরা মিথ্যা বলাকেই নিজেদের ভূমিকায় পরিণত করেছ।” (সূরা ওয়াকিয়াহ ৮২)

وعن أبي مالك الأشعري ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ،

وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ)) رواه مسلم

আবূ মালিক আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "জাহেলিয়াতের চারটি স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে রয়েগেছে, যা তারা ত্যাগ করতে পারেনি। বংশ নিয়ে গর্ব করা, বংশে খোটা দেওয়া, তারকা-রাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং (কারো মৃত্যুতে) রোদন করা। তিনি আরো বলেছেন যে, রোদনকারিণী মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে তাকে আল-কাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিনে দাঁড় করানো হবে।" (মুসলিম)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) [رواه البخاري ومسلم]

যায়েদ ইবনে খালিদ জুহনী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদা -ইবিয়্যাতে রাতে বৃষ্টি হলে ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সকলের দিকে সম্মুখ করে বসে বললেন, "তোমরা জানো কি তোমাদের প্রতি-পালক কি বলেন?" সকলে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। বললেন, 'তিনি বলেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে

ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হলো, সে তো আমার প্রতি মু'মিন (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী)। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী) এবং নক্ষত্রের প্রতি মু'মিন (বিশ্বাসী)।" (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকেও এই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে এসেছে, কেউ কেউ বলেছিল, অমুক অমুক তারা সত্যই বটে। ফলে আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'আমি তারকা-রাজির অস্তমিত হওয়ার শপথ করে বলছি, তোমরা মিথ্যাচারে লিপ্ত।" (সূরা ওয়াক্বিয়া ৭৫-৮২)

যে বিষয়গুলি জানা গেল,

১। সূরা ওয়াক্বিয়ার আয়াতের তাফসীর।

২। জাহেলিয়াতের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। তার কোনো কোনোটি কুফরী পর্যায় পড়ে।

৪। এমনও কুফরী আছে, যা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না।

৫। নিয়ামত অবতরণের কারণে কারো মু'মিন হওয়া আবার করো কাফের হওয়া।

৬। এই ক্ষেত্রে ঈমান বুঝার মত মেধা থাকা।

৭। এই ক্ষেত্রে কুফরী বুঝার মেধা থাকা।

৮। 'অমুক অমুক তারকা সত্য' কথার তাৎপর্য বুঝার মেধা থাকা।

৯। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করে মসলা বের করতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "তোমরা কি জানো তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন?।"

১০। রোদনকারিণীর কঠিন শাস্তি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যেহেতু এই স্বীকৃতি দেওয়াও তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত জিনিস যে, যাবতীয় সম্পদ দানকারী একমাত্র আল্লাহ এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারীও তিনিই, আর এগুলোর স্বীকৃতি মৌখিক ও তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে দিতে হয়, সেহেতু কেউ যদি বলে, অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, তার এই কথা কট্টর তাওহীদ বিরোধী কথা হবে। কারণ, সে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়াকে নক্ষত্রের সাথে সংযুক্ত করেছে। অথচ ওয়াজিব হলো বৃষ্টি ও অন্যান্য যাবতীয় নিয়ামতকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা। কেননা, তিনিই এগুলোর দ্বারা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। নক্ষত্ররাজি কোনো-ভাবেই বৃষ্টি বর্ষণের উপকরণ নয়। বরং বৃষ্টি বর্ষণের উপকরণ হল, আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর দয়া এবং প্রয়োজনানুযায়ী বান্দাদের স্বীয় প্রতি-পালকের নিকট কথা ও কাজের মাধ্যমে চাওয়া। যখন বান্দারা কামনা করে, তখন আল্লাহ দয়াপরবশ উচিত সময়ে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কাজেই বান্দার তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না, যতক্ষণ না সে তার প্রতি এবং অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামতকে স্বীকার করবে এবং এগুলো যে তাঁরই দান, তা মেনে নেবে ও এগুলোর দ্বারা তাঁর ইবাদত সম্পাদনের ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপর সাহায্য গ্রহণ করবে। এরই মাধ্যমে তাওহীদ খাঁটি কি না এবং ঈমান সম্পূর্ণ, না অসম্পূর্ণ, তা বিবেচিত হয়।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

"অনেক মানুষ এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে থাকে।" (সূরা বাক্বারা ১৬৫) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا ﴾ [التوبة:٢٤]

"বল, 'তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" (সূরা তাওবা ২৪)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) [أخرجاه]

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সকল মানুষের চেয়েও বেশী প্রিয় পাত্র না হয়ে যাব।" (বুখারী-মুসলিম)

وَ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)) وَفِي رواية: ((لاَيَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى)) إلى آخره

বুখারী ও মুসলিমে আনাস-ﷺ-থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে সেই-ই ঈমানের মিষ্টতা লাভ করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হবে তার নিকট অন্যদের অপেক্ষা সব থেকে প্রিয়। সে মানুষকে আল্লাহরই নিমিত্তে ভালবাসবে। কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর নিষ্কৃতি দেওয়ার পর, তাতে ফিরে যাওয়াকে সে ঐরূপ অপছন্দ করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে অপছন্দ করে।” অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ((কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের মিষ্টতা লাভ করবে না, যতক্ষণ না---)) হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

وَ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ فِي الله، وَأَبْغَضَ فِي الله، وَوَالَى فِي الله، وَعَادَى فِي الله، فَإِنَّمَا وَلاَيَةَ الله بِذَلِكَ، وَلَن يَجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُوْنَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَ عَامّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، ذَلِكَ لاَيُجْدِىْ عَلَى أَهْلِهِ شَيْئاً)) [رواه ابن جرير]

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসে, আল্লাহর নিমিত্তে ঘৃণা করে এবং আল্লাহর নিমিত্তে বন্ধুত্ব করে ও আল্লাহর নিমিত্তে শত্রুতা করে, সে এর দ্বারা আল্লাহর ভালবাসা লাভ

করে। আর এই রকম না হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দা ঈমানের মিষ্টতা লাভ করতে পারবে না, যদিও তার নামায ও রোযা অধিক হয়ে থাকে। বস্তুতঃ পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হয়ে থাকে। তবে এতে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনকারীর প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধি হবে না।” ইবনে জারির)

"এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে" আল্লাহর এই বাণীর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, প্রকৃত ভালবাসা।

যে মসলাগুলো জানা গেল,

১। সূরা বাক্কারার আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার আয়াতের তাফসীর।

৩। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ভালবাসাকে জান-মাল ও পরিবারবর্গের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া ওয়াজিব।

৪। ঈমানের অস্বীকৃতি, ইসলাম থেকে বহিষ্কারের দলীল নয়।

৫। ঈমানের স্বাদ আছে। কখনো মানুষ তা পায়, আবার কখনো পায় না।

৬। চারটি অন্তর সম্পর্কিত আমল, যার ব্যতিরেকে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায় না এবং তা ব্যতীত ঈমানের স্বাদও কেউ পায় না।

৭। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সাধারণত দুনিয়ার স্বার্থেই হয়ে থাকে। এই বাস্তব ব্যাপারটি সাহাবীর উপলব্ধি।

৮। "এবং তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে" এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

৯। মুশরিকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যে আল্লাহকে দারুণ ভালবাসতো।

১০। যার নিকট (আয়াতে উল্লিখিত) আটটি জিনিস বেশী প্রিয় তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

১১। যে আল্লাহর কোনো অংশীদার স্থাপন করে তাকে আল্লাহর মত ভাল-বাসলে, তার এ কাজ বড় শির্ক হিসাবে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহর বাণী, “অনেক মানুষ এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে।” তাওহীদের মূল ও তার প্রাণ হল, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। আর এটাই হল আল্লাহর প্রকৃত ইবাদত। যতক্ষণ না বান্দার ভালবাসা তার প্রতিপালকের জন্য পূর্ণ হবে এবং সকল ভালবাসার ঊর্ধ্বে তাঁর ভালবাসা স্থান পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করবে না। আর বান্দার সকল ভালবাসা হবে এই ভালবাসার অনুগত, যার উপর বান্দার সৌভাগ্য ও মুক্তি নির্ভর-শীল। এই ভালবাসাকে পূর্ণকারী জিনিসের মধ্যে হল, আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসা। কাজেই আমল ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আল্লাহ যা ভালবাসেন, সেও তা ভালবাসবে এবং তিনি যা ঘৃণা করেন, সেও তা ঘৃণা করবে। তাঁর ওলীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে এবং তাঁর দুশমনদের সাথে শত্রুতা রাখবে। এরই মাধ্যমে বান্দার ঈমান ও তার তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করবে।

আল্লাহর সৃষ্টির কাউকে তাঁর অংশীদার স্থাপন করে তাদেরকে তাঁর মত করে ভালবাসা, তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং তাদের ধ্যানে ও তাদের নিকট প্রার্থনা করাতে নিবিষ্ট থাকা হলো বড় শির্ক, যা ক্ষমা করবেন না। এই শির্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার অন্তর পরাক্রমশীল আল্লাহর ভালবাসা থেকে ছিন্ন ক’রে অন্যের সাথে জুড়ে যে তার জন্য কিছুই করতে পারে না। মুশরিকদের অবলম্বিত এই অনর্থক মাধ্যম সেই কিয়ামতের দিন টুটে যাবে, যখন বান্দা তার আমলের প্রতি-দানের অত্যধিক প্রয়োজন বোধ করবে। আর তখন এই ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বিদ্বেষ ও শত্রুতায় পরিণত হবে। ভালবাসা তিন প্রকারের। যথা,

প্রথমতঃ আল্লাহর ভালবাসা, যা ঈমান ও তাওহীদের মূল।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নিমিত্তে কাউকে ভালবাসা। যেমন, আল্লাহর ওলীদের, তাঁর রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদেরকে ভালবাসা। আমল, কাল ও স্থানসমূহের মধ্যে যা আল্লাহ ভালবাসেন, তা ভালবাসা। এই ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় এবং তার পরিপূরক।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর সাথে কাউকে ভালবাসা। আর এই হল মুশরিকদের তাদের উপাস্য এবং শরীকদেরকে ভালবাসা, যা তারা বৃক্ষ, পাথর, মানুষ এবং ফেরেশতা প্রভৃতির মধ্য থেকে বানিয়ে নিয়ে ছিল। এটাই হল প্রকৃত শির্ক ও তার ভিত্তি। চতুর্থ আরো এক ভালবাসা পাওয়া যায়, যা প্রাকৃতিক ভালবাসা। যে ভালবাসার কারণে বান্দা তিরস্কৃত হয় না। যেমন, পানাহার, বিবাহ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সুন্দর জীবন লাভ ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা। এগুলো যদি বৈধ পন্থায় হয় এবং এগুলোর দ্বারায় যদি আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর অনুসরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা ইবাদতের অধ্যায়ে পড়বে। কিন্তু যদি এগুলো ইবাদতের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী হয় এবং যদি এগুলোর দ্বারা এমন কাজের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তাহলে তা নিষিদ্ধ বস্তুর পর্যায় পড়বে। অন্যথায় তা বৈধ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অধ্যায়
মহান আল্লাহর বাণী

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

[آل عمران:١٧٥]

"ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।" (আল-ইমরান ১৭৫) তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ﴾ [التوبة:١٨]

"তারাই তো আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না, ওদেরই সম্বন্ধে আশা যে, ওরা সৎপথ প্রাপ্ত হবে।" (সূরা তাওবা ১৮) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ﴾ [العنكبوت:١٠]

"কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মত মনে করে।" (সূরা আনকাবূত ১০)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ مَرْفُوْعاً: ((أَنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِيْنِ أَنْ تَرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَ أَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، أَنَّ رِزْقَ اللهِ لاَ يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيْصٍ، وَلاَ يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ))

আবূ সাঈদ-ﷺ-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, দুর্বল বিশ্বাস হল আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ প্রদত্ত রুজীতে

মানুষের প্রশংসা করা। আল্লাহ তোমাকে দেন নাই বলে, তাদের দুর্নাম করা। নিশ্চয় কোনো লোভীর লোভ আল্লাহর রুজি বয়ে আনতে পারে না এবং কোনো অপছন্দকারীর অপছন্দ তা (আল্লাহ রুজি) রোধ করতেও পারে না।

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ أَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَ مَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَ أَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ)) [رواه ابن حبان في صحيحه]

আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং মানুষদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। আর যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি অসন্তষ্টু বানিয়ে দেন।” (ইবনে হিব্বান)

যে মসলাগুলো জানা গেলো

১। সূরা আল ইমরানের আয়াতের তাফসীর।
২। সূরা তাওবার আয়াতের তাফসীর।
৩। সূরা আনকাবূতের আয়াতের তাফসীর।
৪। ঈমান ও ইয়াক্বীন দুর্বলও হয়, আবার শক্তিশালীও হয়।
৫। দুর্বল ইয়াক্বীনের নিদর্শন। তন্মধ্যে উল্লিখিত তিনটি জিনিস।
৬। কেবল আল্লাহকেই ভয় করা হল ফরয বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।
৭। যে আল্লাহর ভয় পরিত্যাগ করে, তার শাস্তির উল্লেখ।
৮। যে আল্লাহকে ভয় করে, তার পুরস্কার।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে লেখক (রহঃ) কেবল আল্লাহকে ভয় করা যে ওয়াজিব, সে কথার উল্লেখ করেছেন এবং কোনো সৃষ্টির উপর আস্থা রাখা যে নিষেধ, তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এ ছাড়া তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে না। তবে এখানে বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের খুবই দারকার যাতে সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে যায়।

জেনে রাখা দরকার যে, ভয়-ভীতি কখনো ইবাদত গণ্য হয়। আবার কখনো তা প্রাকৃতিক ও স্বভাবের আওতায় পড়ে। এটা ভয়-ভীতির কারণ ও তা সম্পর্কীয় বিষয়ের মাধ্যমে বুঝা যায়। যদি ভয়-ভীতি ইবাদত ও উপাসনাযুক্ত ও সেই সত্ত্বার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হয়, যাকে ভয় করছে এবং যার না-ফারমানী করলে ধমক খেতে হয়, তাহলে তার এই ভয়-ভীতি ঈমানের ওয়াজিবসমূহের বড় ওয়াজিবের পর্যায় পড়বে এবং গায়-রুল্লাহকে ভয় করা হবে বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কারণ, সে অন্তরের এই ইবাদতে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে শরীক করেছে। আবার গায়রুল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয়ের থেকে বেশীও হতে পারে। যে কেবল আল্লাহকে ভয় করে, সে হয় নিষ্ঠাবান তাওহীদবাদী। আর যে গায়রুল্লাহকে ভয় করে, সে ঐ ব্যক্তি ন্যায় ভয়-ভীতিতে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীককারী বিবেচিত হয়, যে তাঁর ভালবাসায় অন্যকে শরীক করে। যেমন, কেউ কবরবাসীকে এই জন্য ভয় করে যে, সে তার ক্ষতি করে বসতে কিংবা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে নিয়ামত বন্ধ করে দিবে অথবা অন্য কোনো কারণে, যা কবর পূজারীদের দ্বারা বাস্তবেই হয়।

আর ভয়-ভীতি যদি সহজাত হয়, যেমন কারো শত্রুকে অথবা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকে কিংবা সাপ ইত্যাদিকে ভয় করা, যার বাহ্যিক ক্ষতির

আশঙ্কা থাকে, তবে এই ধরনের ভয় ইবাদত হবে না। অনেক মু'মিনের মধ্যেও এই ভয় বিদ্যমান থাকে। কাজেই এটা ঈমান পরিপন্থী নয়। যদি এই ভয় প্রকৃত কোনো কারণে হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যদি এই ভয় কেবল কোনো কিছু ধারণা করে হয়, যার প্রকৃত কোনো কারণ থাকে না অথবা দুর্বল কারণের ভিত্তিতে হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় হবে এবং ভয়কারী কাপুরুষদের বিশেষণে বিশেষিত হবে। আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কাপুরুষতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন। কাজেই তা হল মন্দ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর এই কারণেই পূর্ণ ঈমান, আল্লাহর উপর আস্থা এবং সাহস এই প্রকারের ভয়কে প্রশ্রয় দেয় না। তাই প্রকৃত ও শাক্তিশালী মু'মিনগণের ঈমানী শক্তি, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা এবং নির্ভিকতার কারণে তাদের সমস্ত ভয়-ভীতি নিরাপত্তায় ও প্রশান্তিতে পরিবর্তন হয়ে যায়।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة:]

"আর আল্লাহর উপরেই ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা মায়েদা ২৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال:٢]

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর।" (সূরা আনফাল ২) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।" (সূরা তালাক্ব ৩) ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাসবু-নাল্লাহ অ নি'মাল ওয়াকীল" দুআটি ইব্রাহীম-ﷺ-তখন পাঠ করেছিলেন, যখন তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে ছিলেন। আর মুহাম্মাদ-ﷺ-উক্ত দুআটি তখন পাঠ করেছিলেন, যখন লোকেরা তাঁকে বলেছিল, "তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমবেত হচ্ছে, কাজেই তাদের ভয় কর। তখন তাঁদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েগেছিল।" (আল-ইমরান ১৭৩)

কতিপয় মসলা জানা গেল

১। (আল্লাহর উপরে) ভরসা করা ফরয বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

২। তা ঈমানের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৩। সূরা আনফালের আয়াতের তাফসীর।

৪। সূরা তালাক্বের আয়াতের তাফসীর।

৫। "হাসবুনাল্লাহ অ নি'মাল ওয়াকীল" এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ দুআ যে, ইব্রাহীম-ﷺ-কঠিন সময়ে তা পাঠ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহর উপর ভরসা রাখা তাওহীদ ও ঈমানের ওয়াজিবসমূহের সুমহান ওয়াজিব। বান্দার আল্লাহর উপর ভরসা যত বলিষ্ঠ হবে, তার ঈমান তত শক্তিশালী হবে এবং তার তাওহীদ তত পূর্ণতা লাভ করবে। আর বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতের যেসব বিষয় সম্পাদন করতে চায় বা ত্যাগ করতে চায়, তাতে সে আল্লাহর উপর ভরসা রাখার এবং তাঁর সাহায্যের অত্যধিক প্রয়োজন বোধ করে। আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসা রাখা হল, বান্দার জেনে নেওয়া যে, সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। যা তিনি চান,

তা-ই হয়, আর যা তিন চান না, তা হয় না। ক্ষতি ও লাভ তাঁরই পক্ষ থেকে এবং দেওয়া ও না দেওয়া সব তাঁরই ব্যাপার। তিনি ব্যতীত কেউ ভাল কাজ করতে পারে না এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে পারে না। এই অবগতির পর বান্দা ইহকালের ও পরকালের কল্যাণ অর্জনে এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি দূরীকরণে তার প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখবে। তার যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহকেই শক্ত করে ধরবে এবং এর সাথে সাথে সে উপকারী উপকরণ ও মাধ্যম অবলম্বন করতে প্রচেষ্টা করবে। যখন বান্দার মধ্যে এই জ্ঞান, এই ভরসা ও বিশ্বাস চিরস্থায়ী হবে, তখনই সে প্রকৃতার্থে আল্লাহর উপর ভরসাকারী বিবেচিত হবে। আর তখন সে তার জন্য আল্লাহর হিফাযতের এবং ভরসাকারীদের সাথে আল্লাহর কৃত অঙ্গীকারের সুসংবাদে ধন্য হবে। আর যখন সে তার সম্পর্ক গায়রুল্লাহর সাথে জুড়বে, তখন সে মুশরিক বিবেচিত হবে। আর যে গায়রুল্লাহর উপরে ভরসা করবে, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হবে এবং তার সকল আশা ব্যর্থ হবে।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف:٩٩]

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।" (সূরা আ'রাফ ৯৯) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر:٥٦]

"পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?" (হিজর ৫৬)

عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ، سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: ((الشِّرْكُ بِا للهِ، وَاليَأْسُ مِن رَّوْحِ اللهِ، وَالأَمْنُ مِن مَكْرِ اللهِ)) [المعجم الكبير للطبراني]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে মহাপাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া।" (ত্বাবরানী)

وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِا للهِ وَالأَمْنُ مِن مَكْرِ اللهِ وَالقَنُوْطُ مِن رَّحْمَةِ اللهِ اليَأْسُ مِن رَّوْحِ اللهِ)) [رواه عبد الرزاق]

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহাপাপ হল, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিজিকে বঞ্চিত মনে করা।

কতিপয় মসলা জানা গেলে

১। সূরা আ'রাফের আয়াতের তাফসীর।
২। সূরা হিজরের আয়াতের তাফসীর।
৩। যে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত, তার কঠিন শাস্তি।
৪। যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়, তারও কঠিন শাস্তি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল যে, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁরই নিকট আশা করা এবং তাঁরই ভীতি অন্তরে সৃষ্টি করা, বান্দার উপর অপরিহার্য। যখন

সে তার পাপ এবং আল্লাহর সুবিচার ও তাঁর শাস্তির কথা ভাববে, তখন সে তার প্রতিপালককে ভয় করবে। আর যখন সে আল্লাহর ব্যাপক ও বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাঁর সেই ক্ষমার দিকে লক্ষ্য করবে যা সকলকে পরিব্যাপ্ত, তখন সে আশা ও আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যখন সে আল্লাহর আনুগত্য করার তাওফীক্ব লাভ করবে, তখন সে এই আনুগত্য কবুল হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ নিয়ামতের আশা করবে এবং তার কোনো ত্রুটির কারণে তার আনুগত্য প্রাত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা করবে। যদি সে কোনো পাপের দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট তার তাওবা কবুল হওয়ার এবং গোনাহ মোচন হওয়ার আশা রাখবে। তাওবায় দুর্বল হলে এবং পাপ করতে থাকলে, (আল্লাহর) শাস্তিকে ভয় করবে। নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করলে, তা অব্যাহত থাকার, আরো অধিক লাভ করার এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তাওফীক্ব লাভের আশা করবে ও অকৃতজ্ঞ হলে, তার লোপ পাওয়ার ভয় করবে। বিপদ-আপদ ও কষ্টে পতিত হলে, আল্লাহর নিকট তার দূরীভূত হওয়ার এবং তা থেকে মুক্তি লাভের আশা করবে। আর এই আশাও করবে যে, আল্লাহ তাকে নেকী দান করবেন, যদি সে মুসীবতের উপর ধৈর্য ধারণ করে। আবার বাঞ্ছিত নেকী থেকে বঞ্চিত হওয়া ও অবাঞ্ছনীয় জিনিসে পতিত হওয়া, এই দুই মুসীবত এক সাথে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কাও করবে, যদি সে অপরিহার্য ধৈর্য ধারণের তাওফীক্ব লাভ না করে।

তাওহীদবাদী মু'মিন তার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভয় ও আশাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আর এটাই হলো ওয়াজিব ও উপকারীও। এরই দ্বারা অর্জিত হয় সৌভাগ্য। আর বান্দার উপর দু'টি খারাপ জিনিসের আশঙ্কা হয়। (১) ভয় -ভীতি এত অধিকহারে তার উপর চেপে বসে যে, সে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। (২) এত বেশী আশা করে ফেলে যে, সে আল্লাহর

পাকড়াও ও তাঁর শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। যখন তার অবস্থা এই সীমায় পৌঁছবে, তখন সে ভয় ও আশার অপরিহার্যতাকে হারিয়ে ফেলবে, যা তাওহীদ ও ঈমানের মূল। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দু'টি নিষিদ্ধ কারণ পাওয়া যায়। যথা,

১। নিজের উপর বান্দার বাড়াবাড়ি করা। হারাম কাজ করতে সাহস করা ও অব্যাহতভাবে তা করতে থাকা এবং গোনাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে বদ্ধপরিকর হওয়া। রহমতের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তার নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ভাবা। আর সব সময় এই অবস্থায় থাকার কারণে রহমত থেকে বঞ্চিত মনে করা, তার গুণ ও তার অবিচ্ছেদ্য স্বভাবে পরিণত হয়। আর এটাই হলো বান্দার কাছ থেকে শয়তানের শেষ কামনা। যখন সে এই অবস্থায় পৌঁছবে, তখন নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা এবং পাপ না করার শক্ত পরিকল্পনা ব্যতীত তার জন্য কল্যাণের আশা করা যাবে না।

২। কৃত পাপের কারণে বান্দার ভয়-ভীতি এত বেশী হয়ে যায় যে, আল্লাহ যে পরম দয়ালু বড়ই ক্ষমাশীল এ ব্যাপারে তার জ্ঞান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুর্খতার কারণে সে মনে করে যে, সে তাওবা ও প্রত্যাবর্তন করলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তার প্রতি রহমও করবেন না। তার মনোবল দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে সে নিরাশ হয়ে পড়ে। আর এ ক্ষতিকর জিনিস সৃষ্টি হয় প্রতিপালকের ব্যাপারে বান্দার দুর্বল জ্ঞান থেকে এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে না জানা ও নিজিকে কমজুরী ও হীন মনে করার কারণে। অথচ এই ব্যক্তি যদি তার প্রতিপালকের ব্যাপারে জানে এবং এই অবগতির জন্য অলসতায় পড়ে না থাকে, তাহলে সামান্য প্রচেষ্টা তাকে তার প্রতিপালকের রহমত

ও তাঁর অনুগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত থাকারও দু'টি সর্বনাশী কারণ রয়েছে। আর তা হল,

১। বান্দার দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে পড়া এবং স্বীয় প্রতিপালক ও তাঁর অধিকার সম্পর্কে জানার ব্যাপারে তার উদাসীনতা। পালনীয় ওয়াজিব কাজ অব্যাহত ধারায় ত্যাগ করা ও তা থেকে উদাসীন থাকা এবং হারাম কাজে শক্তভাবে জড়িত থাকার কারণে আল্লাহর ভয় তার অন্তর থেকে লোপ পেয়ে যায় এবং ঈমানের কোনো কিছুই তার অন্তরে অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, ঈমান থাকলে তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর শাস্তির ভয়-ভীতি সৃষ্টি হত।

২। বান্দা এমন মুর্খ আবেদ হয় যে, সে নিজেকে নিয়েই আশ্চর্যান্বিত হয়। নিজের আমলকে নিয়ে অহঙ্কার করে। আর এই মুর্খতা অব্যাহত থাকার কারণে তার থেকে ভয় দূর হয়ে যায় এবং সে মনে করে যে, তার জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। কাজেই তখন সে নিজের দুর্বল ও নগণ্য সত্ত্বার উপর ভরসা করে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। আর এই থেকেই সে নিন্দিত হয় এবং তার তাওফীক্ব লাভের পথে অন্তরায় থেকে যায়। কারণ, সে নিজেই নিজের উপর যুলুম করেছে।

এই আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, উল্লিখিত জিনিসগুলো তাওহীদ পরিপন্থী।

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ, তাঁর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়

মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]

“যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।” (সূরা তাগাবুন ১১)

আলক্বামা (রহঃ) বলেন, মু’মিন হল সেই ব্যক্তি, যার উপর কোনো বিপদ এলে সে মনে করে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে এবং তা মেনে নেয়।

وَ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أن رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ))

সহী মুসলিমে আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছে, “এমন দু’টি জিনিস মানব সমাজে রয়েছে, যা তাদের মধ্যে থাকা কুফরী। (আর তা হল,) বংশে খোটা দেওয়া এবং মৃতের উপর রোদন করা।”

وَلَهُمَا عَنِ ابنِ مَسْعُوْدِ ﷺ مَرْفُوْعاً: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ))

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, যে গণ্ডদেশে আঁচর কাটে, জামার আস্তিন ফেড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় রোদন করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه الترمذي]

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেল, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন পার্থিব জীবনেই তার

শাস্তি বিধান করেন। পক্ষন্তরে যখন তার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে তার পাপের সাথে আটক করে রাখেন। শেষে কিয়ামত দিবসে তার শাস্তি বিধান করবেন।" (তিরমিযী)

وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ)) [رواه ابن ماجة]

নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "নিশ্চয় বিপদ যত বড় হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যে সন্তষ্টু হয়, তার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা তাগাবুনের আয়াতের তাফসীর।

২। (ধৈর্য ধারণ) ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৩। বংশে খোটা দেওয়া (জাহেলী যুগের প্রথা)।

৪। তার শাস্তি কঠিন, যে গন্ডদেশে আঁচর কাটে, জামার আস্তিন ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় রোদন করে।

৫। আল্লাহর স্বীয় বান্দার কল্যাণ চাওয়ার নিদর্শন।

৬। আল্লাহর স্বীয় বান্দার অকল্যাণ চাওয়ার নিদর্শন।

৭। আল্লাহর স্বীয় বান্দাকে ভালবাসার নিদর্শন।

৮। অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।

৯। মুসীবতে সন্তুষ্ট থাকার নেকী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের উপর সবর করা এবং তাঁর আনুগত্যের উপর সবর করা ও তাঁর অবাধ্যতা না করার উপর সবর করা, শুধু যে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত তা নয়, বরং তা ঈমানের মূল ভিত্তি ও তার শাখা-প্রশাখা। আর এটা সকলের জানা বিষয়। কারণ, পূর্ণাঙ্গ ঈমানই হলো, আল্লাহ যা ভালবাসেন, যাতে তিনি সন্তুষ্ট এবং যা তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম, তাতে ধৈর্য ধরা ও আল্লাহর হারাম করা জিনিসের উপর ধৈর্য ধরা। কেননা, দ্বীন তিনটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন, তার সত্যায়ন করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা। কাজেই আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য কষ্টকর হলেও তাতে সবর করা উল্লিখিত সাধারণ বিষয়ের আওতায় পড়ে। তবে ধৈর্য সম্পর্কে জানা ও সেই অনুযায়ী আমল করার প্রয়োজন খুবই বেশী, বিধায় তা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বান্দা যখন জানবে যে, বিপদাপদ আল্লাহর নির্দেশেই আসে, আর আল্লাহ এ ব্যাপারে অত্যধিক কৌশলী, বান্দার উপর এই বিপদ নির্ধারণ করার পিছনে রয়েছে তার জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ নিয়ামত, তখন সে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে। তাঁর নির্দেশকে মেনে নিবে এবং কষ্টের উপর ধৈর্য ধরবে। আর এতে তার উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, তাঁর সাওয়াবের আশা, তাঁর শাস্তিকে ভয় করা এবং উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। আর তখন তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং তার ঈমান ও তাওহীদ বলিষ্ঠ হবে।

‘রিয়া’ (লোক দেখানী কাজ) প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর বাণী,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف:١١٠]

“বল, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ-উপাস্য একমাত্র উপাস্য।” (সূরা কাহফ ১১০)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَرْفُوعاً: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) رواه مسلم

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে মার্ফে সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমি শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে মুক্ত ও সম্পর্কহীন। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে, যে আমলে সে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তাকে তার শির্কসহ বর্জন করব।” (মুসলিম)

وَعَنْ سَعِيْدٍ مَرْفُوعاً: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلَى، فَقَالَ: ((الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ)) [رواه أحمد]

আবূ সাঈদ-ﷺ-থেকে মার্সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের খবর দিবো না, যা আমার নিকট দাজ্জালের চেয়েও বেশী ভয়াবহ? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, “তা হল সুক্ষ্ম শির্ক। কোনো ব্যক্তি এই জন্য খুব সুন্দর করে নামায পড়ে যে, তার দিকে অন্য কোনো ব্যক্তি তাকিয়ে আছে।” (আহমদ)

কপিতয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা কাহাফের আয়াতের তাফসীর।

২। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভালকাজে গায়রুল্লাহর প্রভাব থাকলে তাপ্রত্যাখ্যাত হয়।

৩। তার কারণের উল্লেখ। আর তা হল, পূর্ণরূপে অন্যের মুখা পেক্ষীহীনতা।

৪। আমল বরবাদ হওয়ার কারণসমূহের অন্যতম কারণ হলআল্লাহ সমস্ত শরীক থেকে মুক্ত।

৫। নবী করীম-ﷺ-এর স্বীয় সাহাবীদের ব্যাপারে রিয়ার আশঙ্কা।

৬। তিনি-ﷺ-রিয়ার ব্যাখ্যা এইভাবে করলেন যে, মানুষ আল্লাহর জন্যই নামায পড়ে, কিন্তু সুন্দর করে এই জন্য পড়ে যে, কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

লেখক রিয়া বা লোক দেখানো কাজের প্রসঙ্গ আলোচনা করার পরে পরেই বলেন মানুষ তার অমল দ্বারা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্য পোষণ করলে, তা শির্কের আওতায় পড়বে। জেনে রাখা দরকার যে, ইখলাস হল দ্বীনের মূল ভিত্তি এবং তাওহীদ ও ইবাদতের প্রাণ। আর ইখলাস হল, বান্দার তার যাবতীয় আমল দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাঁর নিকট নেকী এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ। ফলে সে ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয় এবং ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করার যথাযথ যত্ন নেবে। আল্লাহ ও বান্দার অধিকারসমূহকে আদায় করবে। আর এতে তার উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের শান্তি লাভ। এতে লোক দেখানো খ্যাতি, সরদারী এবং দুনিয়া লাভের কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। আর এরই দ্বারাই তার ঈমান ও তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করবে।

ঈমান ও তাওহীদের কট্টর পরিপন্থী জিনিস হল, মানুষের কাছে প্রশংসা ও তাদের নিকট সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদেখানী কোনো কাজ করা অথবা দুনিয়া অর্জনের জন্য করা। আর এটাই হল ইখলাস ও তাওহীদে দোষযুক্তকারী জিনিস। 'রিয়া' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর তা হল, বান্দাকে আমলে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয় এবং এই জঘন্য উদ্দেশ্যে সে যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা ছোট শির্কে পরিণত হবে। আর যদি বান্দাকে আমলে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাথে সাথে লোক দেখানোও হয়, আন 'রিয়া' থেকে সে যদি ফিরে না আসে, তাহলে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, এই ক্ষেত্রেও আমল বরবাদ হবে। আর যদি বান্দাকে আমলে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়, আর আমল করার সময়ে রিয়ার উদয় হয়, এমতাবস্থায় সে যদি তা দূর ক'রে নিয়ত ঠিক করে নেয়, তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু রিয়া যদি তার মধ্যে থেকে যায় এবং তার প্রতি সে যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে আমল কমে যাবে এবং রিয়াকারীর অন্তরে যে পরিমাণ রিয়া থাকবে, সেই পরিমাণ তার ঈমান ও ইখলাসে দুর্বলতা আসবে এবং আল্লাহর জন্য কৃত আমল ও তার সাথে মিশ্রিত রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলবে।

রিয়া বড় এক বিপজ্জনক জিনিস, যার সংশোধনের অতীব প্রয়োজন। নাফসের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টি করা রিয়া এবং ক্ষতিকর উদ্দেশ্য অন্তর থেকে দূরীভূত করা ও এর জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করারও খুব দরকার। যাতে আল্লাহ বান্দার ঈমানকে খাঁটি ঈমানে পরিণত করেন এবং তাকে প্রকৃত তাওহীদবাদী করেন। দুনিয়ার জন্য ও পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির

জন্য কাজ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যদি বান্দার সম্পূর্ণ ইচ্ছা এই রকমই হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও আখেরাত অর্জনের কোনো ইচ্ছা যদি তার না থাকে, তাহলে এর জন্য তার আখেরাতে কোনো অংশ থাকবে না। তবে এই ধরনের কাজ কোনো মু'মিন দ্বারা হয় না। কারণ, মু'মিন দুর্বল ঈমানের হলেও সে তার কাজের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতই কামনা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং দুনিয়া অর্জন উভয়ের জন্য কাজ করে এবং উভয় উদ্দেশ্য যদি সমান সমান বা কাছাকাছি হয়, তবে এই ব্যক্তি মু'মিন হলেও তার ঈমান, তাওহীদ এবং ইখলাসে ঘাটতি থাকবে। আর ইখলাস না থাকার কারণে তার আমলেও ঘাটতি থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাজ করে এবং সে তার কাজে পূর্ণ নিষ্ঠাবান হয়, কিন্তু সে তার কাজের বিনিময় নিয়ে স্বীয় কাজের ও দ্বীনের উপর সাহায্য গ্রহণ করে, যেমন, ভাল কাজের উপর বেতন ইত্যাদি গ্রহণ করা এবং যেমন আল্লাহর পথের মুজাহিদ যে জিহাদে গনিমতের মাল অথবা রুজি হাসিল করে অনুরূপ ওয়াক্কফের মাল, যা মসজিদ, মাদরাসা এবং দ্বীনি কাজের উপর নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়, এ সব নেওয়াতে বান্দার ঈমান ও তাওহীদের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, সে তার আমল দ্বারা দুনিয়া কামনা করেনি। বরং তার ইচ্ছা ছিল দ্বীনের খেদমত করা এবং যা সে অর্জন করছে, তার দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের কাজে সাহায্য গ্রহণ করা। আর এই জন্যই আল্লাহ যাকাত ও গনিমতের মাল ইত্যাদি শরীয়তী সম্পদে তাদের জন্য এক বড় অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যারা দ্বীনি কাজে এবং পার্থিব উপকারী কাজে নিযুক্ত।

বিস্তারিত এই আলোচনা তোমাদের নিকট অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এই মসলার বিধান পরিষ্কার করে দেয় এবং প্রত্যেক বিষয়কে তার যথাযথ স্থানে রাখা তোমাদের উপর ওয়াজিব করে দেয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দুনিয়া অর্জনের জন্য ভাল কাজ করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾ [هود١٥-١٦]

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিবো এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরা এমন লোক যে, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছে, সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জনা করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।" (সূরা হূদ ১৫-১৬)

وَفِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيْلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ))

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "দীনার ও দিরহামের দাস ধ্বংস হয়েছে।" রেশমের দাস ধ্বংস হয়েছে। ভাল কাপড়ের দাস ধ্বংস হয়েছে। তাকে দেওয়া হলে, সন্তুষ্ট হয়, আর না দওেয়া হলে, অসন্তুষ্ট হয়। ধ্বংস হোক। অবনত হোক। আর কাঁটা বিদ্ধ হলে, তা যেন খুলে ফেলার ক্ষমতা না হোক। সেই বান্দা

সৌভাগ্যবান, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কেশ আলু-থালু। তার পদদ্বয় ধুলি ধুসারিত। যদি তাকে পাহারায় লাগানো হয়, তাহলে সে পাহারায় লেগে থাকে। যদি তাকে পশ্চাতের বাহিনীতে লাগানো হয়, তবে সে তাতেই লেগে থাকে। সে অনুমতি চায়লে, তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং সে সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না।”

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। মানুষের আখেরাতের কাজ দ্বারা দুনিয়া লাভের ইচ্ছা।
২। সূরা হূদের আয়াতের তাফসীর।
৩। মুসলিমদের দীনার ও দিরহামের দাস নামে নামকরণ।
৪। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট। আর না পেলে অসন্তুষ্ট।
৫। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, “সে ধ্বংস হোক এবং অবনত হোক।”
৬। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, কাঁটা বিদ্ধ হলে, তা খুলে ফেলার ক্ষমতা না হোক।”
৭। হাদীসে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা করা হয়েছে।

হালাল ও হারামের ব্যাপারে আলেমগণ ও নেতাদের আনুগত্য করলে, তাদেরকে রব্ব বানিয়ে নেওয়া হয়

ইবনে আব্বাস বলেন, সেই সময় অতি নিকটে, যে সময় তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা হবে। আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন। আর তোমরা বলছ, আবূ বাকার ও উমার বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল বলেন, সেই জাতির ব্যাপার বড়ই আশ্চর্যজনক,

যে জাতি হাদীসের সঠিক সূত্র ও তার বিশুদ্ধতা অবগতির পরও সুফিয়ান সাওরীর মতামত অবলম্বন করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور:٦٣]

"যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সূরা নূর ৬৩) ফিৎনা কি তা কি তোমরা জানো? ফিৎনা হল শির্ক। হতে পারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কোনো কথাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তার অন্তরে বিভ্রান্তিকর কোনো কিছু উদয় হবে এবং তাতেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ الله ﴾ (التوبة:٣١) فَقُلْتُ لَهُ أَنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ: ((أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ، وَيُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ)) فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: ((فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ)) [رواه أحمد والترمذي]

আদি ইবনে হাতিম-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন, "তারা তাদের ধর্মের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছে।" (সূরা তাওবা ৩১) তখন আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। তখন তিনি-ﷺ-বললেন, "তোমরা কি এ রকম করো না যে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা তারা হারাম করলে, তোমরাও তা হারাম মনে কর এবং

যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তা তারা হালাল করলে, তোমরাও তা হালাল মনে কর?" আমি বললাম, হ্যাঁ, এ রকম আমরা করি। তখন তিনি বললেন, "এটাই হল তাদের ইবাদত করা।" (আহমদ ও তিরমিযী) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান (ভাল) বলেছেন।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা নূরের আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার আয়াতের তাফসীর।

৩। আদি ইবনে হাতিম-ﷺ-ইবদতের যে অর্থকে অস্বীকার করতেন, সে ব্যাপারে তাঁকে জ্ঞাত করানো।

৪। ইবনে আব্বাস, আবূ বাকার ও উমার-ﷺ-দের দৃষ্টান্ত এবং ইমাম আহমদের সুফিয়ান সাওরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা।

৫। অবস্থার এইভাবে পরিবর্তন ঘটেছে যে, অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে পণ্ডিত-পুরোহিতদের পূজা করা সর্বোত্তম কাজ বিবেচিত হয় এবং এটাকে 'বিলায়াত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর পণ্ডিতদের ইবাদত ইলম ও ফিক্বাহ বলে স্বীকৃত হয়। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন এই পর্যন্ত ঘটেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত তার পূজাও আরম্ভ হয়ে গেছে, যে কোনো পুণ্যবান ব্যক্তিদের আওতায় পড়ে না। এটাকে এইভাবেও বলা যায় যে, তারও ইবাদত শুরু হয়ে গেছে, যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলো না, বরং একেবারে মুর্খ ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النساء ٦٠]

"তুমি কি তাদেরকে দেখো না, যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ের উপর তারা ঈমান এনেছে।" (নিসা ৬০)

লেখক যা কিছু উল্লেখ করেছেন, তা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রব্ব এবং উপাস্য তিনিই, যিনি ভাগ্য সাম্পর্কীয় বিধান, শরীয়তী বিধান এবং শাস্তিদান সম্পর্কীয় বিধানের মালিক। উপাসনা ও ইবাদত কেবল তাঁরই করা দরকার। তাঁর কোনো শরীক নেই। তার কোনো রকমের আবাধ্যতা না করে শুধু তাঁরই অনুসরণ করা কর্তব্য। অন্যের অনুকরণ ও অনুসরণ তাঁর অনুসরণের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। কাজেই যখন বান্দা উলামা ও নেতাদেরকে এইভাবে গ্রহণ করবে যে, তাদের অনুসরণকে প্রকৃত অনুসরণ মনে করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকে তাদের অনুসরণের পারিপার্শ্বিক ভাববে, তখন সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে রব্বরূপে গ্রহণকারী, তাদের সে উপাসনাকারী, তাদের নিকট থেকে বিচার-ফয়সালা গ্রহণকারী এবং তাদের বিচার-ফয়সালাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালার উপর প্রাধান্য দানকারী গণ্য হবে। আর এটাই হলো প্রকৃত কুফরী। সমস্ত ফয়সালার মালিক তো তিনিই। অনুরূপ সমস্ত ইবাদতের যোগ্যও তিনিই।

গায়রুল্লাহকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ না করা এবং বিবাদীয় বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূললের দিকে ফিরানো হল প্রত্যেকের অপরিহার্য কর্তব্য। এরই মাধ্যমে বান্দার দ্বীনের সব কিছুই আল্লাহর জন্য নিবেদিত এবং তার তাওহীদ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে খাঁটি ও নির্মল। যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালাকে গ্রহণ করবে না, সে তাগুতের ফয়সালা গ্রহণকারী গণ্য হবে। আর যদি সে নিজেকে মু'মিন ভাবে, তাহলে সে মিথ্যুক বিবেচিত হবে। সুতরাং ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ

ও পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে এবং তার শাখা-প্রশাখায় ও যাবতীয় অধিকারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মীমাংসকে গ্রহণ করা হবে। আর এটাকেই লেখক শেষ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। অতএব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্যের ফয়সালা গ্রহণ করল, সে তাকে রব্ব বানিয়ে নিলো এবং সে তাগুতের ফয়সালাকে গ্রহণ করল।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء:٦٠]

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" (নিসা ৬০) তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة:١١]

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করি।" (সূরা বাক্বারা ১১) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف:٥٦]

"পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না।" (সূরা আ'রাফ ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]

"তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে?" (মায়েদা ৫০)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ)) [قَالَ النَّووِي: حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিষয়ের অনুসারী হবে।" (ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি সহী। আমরা সহী সূত্রে 'কিতাবুল হুজ্জাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

ইমাম শা'বী বলেন, একজন মুনাফেক ও একজন ইয়াহুদীর মধ্যে বিবাদ ছিল। তাই ইয়াহুদী বলল, আমরা মুহাম্মদের-ﷺ-নিকট থেকে ফয়সালা নিব। কারণ সে, জানত যে, তিনি ঘুষ গ্রহণ করেন না। আর মুনাফেক বলল, আমরা ইয়াহুদীর কাছ থেকে ফয়সালা নিব। কারণ, সে জানত যে, তারা ঘুষ গ্রহণ করে। অবশেষে উভয়েই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা জোহাইনা গোত্রের কোনো জ্যোতিষীর কাছ থেকে ফয়সালা নিবে। ফলে এই আয়াত অবতীর্ন হয়, 'তুমি কি তাদেরকে দেখ না, যারা দাবী করে যে,।" (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) আবার কেউ

কেউ বলেছেন, এই আয়াত সেই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যারা আপসে বিবাদে লিপ্ত ছিল। তাদের একজন বলল, আমাদের বিষয় নবী করীম-ﷺ-এর নিকট পেশ করব। অপরজন বলল, কাআ'ব ইবনে আশরাফের নিকট পেশ করব। অতঃপর তারা বিষয়টি উমার-رضي الله عنه-এর নিকটে পেশ করল। তাদের একজন উমার-رضي الله عنه-কে প্রকৃত ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। ফলে তিনি যে রাসূলের ফয়সালাতে সন্তুষ্ট নয়, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনা কি সত্য? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে দিলেন।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা নিসার আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের অর্থ বুঝার সাহায্যও তাতে আছে।

২। সূরা বাক্বারার আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা আ'রাফের আয়াতের তাফসীর।

৪। সূরা মায়েদার আয়াতের তাফসীর।

৫। প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে ইমাম শা'বী যা বলেছেন।

৬। সত্য ও মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭। মুনাফেকের সাথে উমারের সংঘটিত ঘটনা।

৮। ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমান অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর আনীত বিষয়ের অনুসারী হবে।

আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীর কোনো কিছুর যে অস্বীকার করবে,

মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُوْن بالرَّحْمَن ﴾ [الرعد: ٣٠]

“তারা রহমানকে অস্বীকার করে।” (রা’দ ৩০) সহী বুখারীতে এসেছে, আলী-رضي الله عنه-বলেছেন, ‘মানুষকে তা-ই বল, যা তারা বুঝো। তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা স্বাব্যস্ত করতে চাও?” আব্দুর রাযযাক মা’মার থেকে, তিনি তাউস হতে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল-ﷺ-এর নিকট আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কীয় একটি হাদীস শুনার সময় এক ব্যক্তিকে বিচলিত হতে দেখে বললেন, এই লোকগুলোর ভাগ করা কি রূপ? স্পষ্ট আয়াতগুলো মেনে নেয়। আর অস্পষ্ট আয়াতের বেলায় তারা ধ্বংস হয়ে যায়?। আর কুরাইশরা যখন আল্লাহর রাসূলকে ‘রাহমান’ উল্লেখ করতে দেখল, তখন তারা তা অস্বীকার করল। ফলে তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হল, ‘তারা রহমানকে অস্বীকার করে।’

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীর কোনো কিছু অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না।

২। সূরা রা’দের আয়াতের তফসীর।

৩। শ্রবণকারী বুঝে না এমন কথা বলা ত্যাগ করা।

৪। কারণ, এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা স্বাব্যস্ত করা হয়।

৫। যে আল্লাহর গুণাবলীর কোনো কিছু অস্বীকার করে, তার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের উক্তি, অস্বীকারই তাকে ধ্বংস করেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ, তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলীর উপরে ঈমান আনাই হল প্রকৃত ঈমান ও তার মূল ভিত্তি। আর এই বিষয়ে বান্দার জ্ঞান ও ঈমান

যত বলিষ্ঠ হবে এবং এরই ভিত্তিতে যখন সে আল্লাহর ইবাদত করবে, তখন তার তাওহীদও শক্তিশালী ও মজবূত হবে। যখন বান্দা এই অবগতি লাভ করবে যে, আল্লাহই পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। তিনিই মাহাত্ম্য, গৌরব এবং সৌন্দর্যের মালিক এবং পূর্ণতায় তাঁর মত কেউ নেই, তখন এই অবগতি আল্লাহকেই একমাত্র সত্যিকার উপাস্য ভাবাকে এবং তিনি ব্যতীত অন্য ইলাহকে মিথ্যা মনে করাকে ও বাস্তবে তার রূপ দেওয়াকে তার উপর অপরিহার্য করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলীর কোনো কিছু অস্বীকার করবে, সে তাওহীদ বিরোধী ও তাওহীদ পরিপন্থী কাজ সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। আর এটাই হলো কুফরী পর্যায়ের জিনিস।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُوْنَهَا﴾ [النحل: ٨٣]

"তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে।" (নাহল ৮৩) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন, তার তাৎপর্য হল, কোনো ব্যক্তির বলা, এটা তো আমার এমন সম্পদ, যা আমি বাপ-দাদাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি।

আউন ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, এই আয়াত সেই ব্যক্তির প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে, যে বলে, যদি অমুক না হত, তাহলে এ রকম হত না।

ইবনে কুতাইবা বলেন, এই আয়াত তাদের প্রতিবাদে যারা বলে, এসব আমাদের উপাস্যদের সুপারিশের ফল।

আবুল আব্বাস যায়েদ ইবনে খালিদের সেই হাদীস উল্লেখ করে বলেন, যাতে আছে যে, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দার কেউ কেউ আমার প্রতি বিশ্বসী হয়ে এবং কেউ কেউ আমার সাথে কুফরী করে প্রভাত করেছে।" হাদীস পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর এই ধরনের কথা কুরআনে ও হাদীসে অনেক। আল্লাহ তাকে নিন্দা করেছেন, যে তাঁর নিয়ামতকে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করে এবং তাঁর সাথে শরীক করে।

সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, ব্যাপারটা হল এই যে, যেমন লোকে বলে, বাতাস ভাল ও অনুকুল ছিল এবং মাঝি-মাল্লাও অভিজ্ঞ ছিল। এই ধরনের কথা-বার্তা, যা অনেকেই বলাবলি করে।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। অনুগ্রহ সম্পর্কে অবগতির পর তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

২। জানা গেলো যে, অনেকেই এই ধরনের কথা বলাবলি করে।

৩। এই ধরনের কথা-বার্তাকে নিয়ামতের অস্বীকার নামে নামকরণ।

৪। পরস্পর বিরোধী দু'টি জিনিসের অন্তরে বিদ্যমান থাকা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

কথা ও স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে নিয়ামতকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা সৃষ্টির অপরিহার্য কর্তব্য। এর দ্বারাই তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি মৌখিক ও আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে, সে কাফের গণ্য হবে। দ্বীনের কোনো কিছুই তার কাছে থাকবে না। আর যে ব্যক্তি অন্তর থেকে স্বীকার করবে যে, সমস্ত নিয়ামত কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, কিন্তু সে মুখে কোনো সময় নিজের দিকে, আবার কোনো সময় অন্যের প্রচেষ্টার দিকে সম্পর্কিত করে। যেমন,

অনেক মানুষের মুখে বলাবলি হতে থাকে, এই ক্ষেত্রে এই ধরনের কথা-বার্তা থেকে তাওবা করা এবং নিয়ামতের সত্যিকার মালিক ব্যতীত অন্যের দিকে তা সম্পর্কিত না করা বান্দার উপর ওয়াজিব হবে। নিজেকে এইভাবেই গঠন করার প্রচেষ্টা করবে। কথা ও স্বীকারোক্তির দ্বারা যতক্ষণ না এই স্বীকৃতি দেওয়া হবে যে, সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান বাস্তব ঈমান বিবেচিত হবে না। কারণ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, যা ঈমানের মেরুদণ্ড, তা তিনটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) তার ও অন্যের উপর আল্লাহর যাবতীয় অনুগ্রহের আন্তরিক স্বীকৃতি। (২) নিয়ামতের প্রচার করা এবং এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা। (৩) নিয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা অনুগ্রহকারীর অনুসরণ এবং তাঁর ইবাতদ করার উপর সহযোগিতা কামনা করা। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

অধ্যায়

আল্লাহর বাণী

﴿ فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]

"সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না।" (সূরা বাক্বারা ২২) ইবনে আব্বাস আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আনদাদ' এমন শির্ক, যা অন্ধকার রাতে কালো পথরের উপর চলমান পিপীলিকার চাল থেকেও সূক্ষ্ম। আর তা হল, তোমার এই ধরনের কথা, আল্লাহর শপথ এবং তোমার জীবনের শপথ। অমুক ও আমার জীবনের কসম! যদি ছোট কুকুরটা না থাকত, তাহলে বাড়িতে চোর ঢুকে পড়ত। যদি বাড়িতে হাঁস না থাকত, তবে চোর প্রবেশ করে যেত। আর কারো তার সাথীকে বলা, আল্লাহ এবং তুমি না চাইলে। আবার কোনো মানুষের এই কথা বলা যে,

আল্লাহ এবং অমুক না থাকলে, অমুককে নিযুক্ত করো না। এই ধরনের সমস্ত কথা-বার্তা (ছোট) শির্কের আওতায় পড়ে।

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)) [رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم]

উমার ইবনে খাত্তাব-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করল, সে কুফরী করল অথবা শিৰ্ক করল।" (ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-বলেন, আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা আমার নিকট গায়রুল্লাহর নামে সত্য শপথ গ্রহণ করা থেকে বেশী প্রিয়।

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ)) [رواه ابو داود بسند صحيح]

হুযাইফা নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "তোমরা এ কথা বলো না যে, 'আল্লাহ এবং অমুক ইচ্ছা করলে।' বরং বলবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন। অতঃপর অমুক যা ইচ্ছা করেছে।" (ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটিকে সহী সনদে বর্ণনা করেছেন)।

ইব্রাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আমি আল্লাহ এবং তোমার আশ্রয় কামনা করছি' এরূপ বলাকে অপছন্দ করতেন। তবে তিনি 'আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি, অতঃপর তোমার' এইভাবে বলা জায়েয মনে করতেন। অনুরূপ তিনি বলতেন, 'আল্লাহ না থাকলে, অতঃপর অমুক' এইরূপ বলা বাঞ্ছনীয়। আর তোমরা এরূপ বলো না, আল্লাহ এবং অমুক না থাকলে।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা বাক্বারার আয়াতে উল্লিখিত ‘আনদাদ’ শব্দের ব্যাখ্যা।

২। সাহাবায়ে কেরাম-ﷺ-বড় শির্ক সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন যে, তা ছোট শির্ককেও শামিল।

৩। গায়রুল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ (ছোট) শির্ক।

৪। গায়রুল্লাহর নামে সত্য কসম আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম থেকেও বড় গোনাহ।

৫। ভাষায় ব্যবহৃত ‘অয়াও’ (এবং) ও ‘ষুম্মা’ (অতঃপর) এর মধ্যে পার্থক্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পূর্বের অধ্যায় আল্লাহর বাণী, ‘অনেক মানুষ এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে।” এর উদ্দেশ্য ছিল, বড় শির্ক। অর্থাৎ, ইবাদত, ভালবাসা, ভয়-ভীতি এবং আশা করা ইত্যাদি ইবাদতসমূহে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। আর এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল, ছোট শির্ক। যেমন, কথার শির্ক। অর্থাৎ, যেমন গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া, কথার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে শরীক করা। যেমন বলা, যদি আল্লাহ এবং অমুক না হত। আল্লাহ ও তোমার কসম করে বলছি। অনুরূপ কোনো ঘটন-অঘটনকে গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে বলা, যদি পাহারাদার না থাকত, চোর ঢুকে যেত। অমুকের ঔষধ না হলে, মারা যেত। অমুকের দোকানে যদি অমুক অভিজ্ঞ ব্যক্তি না থাকত, তবে কিছুই অর্জিত হতো না। এই ধরনের যাবতীয় কথা-বার্তা তাওহীদ পরিপন্থী। কর্তব্য হল, প্রত্যেক বিষয়কে,

ঘটন-অঘটনকে এবং উপকারী মাধ্যমকে সর্ব প্রথম আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত করা। তবে এর সাথে সাথে মাধ্যমের উপকার ও তার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলতে পারে, যদি আল্লাহ না করতেন, অতঃপর এরকম না হলে। যাতে সে জেনে নেয় যে, সমস্ত মাধ্যমই আল্লাহর ফয়সালা এবং তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের সাথে আবদ্ধ। কাজেই বান্দার তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না, যতক্ষণ না সে বিশ্বাস এবং কথা ও কাজে আল্লাহর সাথে শির্ক করা ত্যাগ করবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে পরিতৃপ্ত হয় না

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِـالله فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَـرْضَ بِـالله فَلَـيْسَ مِـنْ الله))

[رواه ابن ماجة بسند حسن]

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের নাম ধরে কসম খেও না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করে, তাকে সত্য মেনে নিতে হয়। আর যার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হয়, তাকে সন্তুষ্ট হতে হয়। যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাফল্য আসে না।" (ইমাম ইবনে মাজাহ হাদীসটিকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। পিতৃপুরুষদের নাম ধরে কসম করা নিষেধ।

২। যার জন্য আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করা হয়, তাকে সন্তুষ্ট হওয়ার নির্দেশ।

৩। যে সন্তুষ্ট হয় না, তার শাস্তি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হলো, যখন তোমার প্রতিপক্ষকে শপথ গ্রহণের কথা বলা হয়, আর সে যদি সত্যবাদী বলে পরিচিত থাকে অথবা বাহ্যিক সে যদি ভাল ও ন্যায়পরাণ হয়, তাহলে তার শপথে সন্তুষ্ট হওয়া এবং তা মেনে নেওয়া তোমার উপর নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ, তোমার নিকট এমন কোনো নিশ্চিত জিনিস নেই, যার দ্বারা তুমি তার সত্যের বিরোধিতা করতে পারবে। আর মুসলিমরা যেহেতু তাদের প্রতিপালককে সম্মান ও মর্যাদা দান করে, তাই তোমার কর্তব্য আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করলে, তা মেনে নেওয়া। আর তুমি যদি প্রতিপক্ষের জন্য আল্লাহর কসম কর, কিন্তু সে তালাকের কসম, অথবা তার জন্য সাজার বদ্দুআ করা ছাড়া তা না মানে, তাহলে এটা উল্লিখিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এটা আল্লাহর শানে অশিষ্ট ও অসম্মান গণ্য হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে ভুল প্রতিপন্ন করা হবে। তবে যে ব্যক্তি অশ্লীলতা এবং মিথ্যাচারে পরিচিত, সে যদি কোনো এমন ব্যাপারে কসম খায়, যাতে তার মিথ্যা সুনিশ্চিত, সেই ক্ষেত্রে তার কসমকে মিথ্যা স্বাবস্ত্য করে তুমি যদি মেনে না নাও, তবে তা উল্লিখিত শাস্তির আওতায় পড়বে না। কেননা, তার মিথ্যা সম্পর্কে জানা গেছে। তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি সম্মান নামের কোনো জিনিসই নেই যে, মানুষ তার কসমে সন্তুষ্টি হতে পারে। তাই পরিষ্কার যে, এটা উল্লিখিত শাস্তির বহির্ভূত জিনিস। কারণ, তার (মিথ্যার) ব্যাপারটা সুনিশ্চিত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আল্লাহর এবং তোমার ইচ্ছা-এই উক্তি প্রসঙ্গে

عَنْ قُتَيْلَةَ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا

وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَأَن يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ)) [رواه النسائي]

কুতাইলা থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইয়াহুদী নবী করীম-ﷺ-এর নিকট এসে বলল, তোমরা তো শির্ক কর। তোমরা বল, যা আল্লাহ এবং অমুক ইচ্ছা করে। আর তোমরা বল, কা'বার কসম। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-লোকদের নির্দেশ দিলেন যে, "তোমরা যখন শপথ গ্রহণের ইচ্ছা করবে, তখন বলবে, কা'বার রবের কসম। আর বলবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। অতঃপর অমুক।" (ইমাম নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সহীহ বলেছেন)।

وله أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَجَعَلْتَنِي لله ندا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ))

নাসায়ী শরীফেই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলল, আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "তুমি তো আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে দিলে? বরং কেবল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"

وَلِابْنِ مَاجَةَ، عَنْ طُفَيْلِ بْنِ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُوْدِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللهِ، قَالُوْا: وَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنْ النَّصَارَى فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا

أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ((أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: مَاشَاءَ اللهُ وَحْدَهُ))

ইবনে মাজাহ শরীফে আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহার বৈপিত্রীয় ভাই তুফাইল-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন ইয়াহুদীদের এক দলের নিকটে গেলাম। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা উত্তম জাতি হতে, যদি তোমরা 'উযায়ের' আল্লাহর পুত্র, এমন কথা না বলতে। তখন তারা বলল, তোমরাও উত্তম জাতি হতে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন, এমন কথা না বলতে। অতঃপর খ্রীষ্টানদের এক দলের নিকটে গেলাম। তাদেরকে বললাম, তোমরা উত্তম জাতি হতে, যদি তোমরা মাসীহ আল্লাহর পুত্র, এমন কথা না বলতে। তখন তারা বলল, তোমরাও উত্তম জাতি হতে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন, এমন কথা না বলতে। যখন সকালে উঠলাম, তখন এই খবর যাকে দিতে পারলাম, দিলাম। অতঃপর নবী করীম-ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে এই খবর দিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি এই খবর অন্য কাউকে দিয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। (তুফাইল) বলেন, অতঃপর তিনি-ﷺ-আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, কথা হচ্ছে, তুফাইল একটি স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে সম্ভব হয়েছে, দিয়েছে। তোমরা এমন কথা বল,

যা থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করব মনে করি, কিন্তু এই এই কারণে করতে পারিনি। কাজেই তোমরা এ কথা বলো না যে, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ যা ইচ্ছা করেন। বরং বলবে, কেবল আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। ছোট শির্ক সম্পর্কে ইয়াহুদীদের অবগতি।

২। প্রবৃত্তির আবির্ভাবের সময় মানুষের বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

৩। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, "তোমরা কি আমাকে আল্লাহর শরীক স্থাপন করেছ?" তবে তার অবস্থা কি হতে পারে যে (নবী করীম-ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে) বলে, হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আপনি ব্যতীত আমার কোনো আশ্রয় নেই।

৪। এই ধরনের কথা-বর্তা বড় শির্কের আওতায় পড়ে না। কারণ, রাসূ-লুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "এই এই কারণে আমি মানা করতে পারি না।"

৫। সত্য স্বপ্ন অহীর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

৬। সত্য স্বপ্ন কোনো কোনো শরীয়তী বিধানের কারণও হয়।

যে সময়কে গালি দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾

[الجاثية:٢٤]

"তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।" (সূরা জাসিয়া ২৪)

وَفِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)) وفي رواية:

((لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ))

সহী হাদীসে আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি -ﷺ-বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তান যুগকে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই যুগ (এর বিবর্তনকারী)আমিই দিবা-রাত্রির আবর্তন করে থাকি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমরা যুগকে গালি দিও না। কারণ, আল্লাহই যুগের বিবর্তনকারী।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। যুগকে গালি দেওয়া নিষেধ।

২। তা আল্লাহকে গালি দেওয়া বলে অভিহিত করা।

৩। আল্লাহই যুগ এই কথাটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা।

৪। কখনো আন্তরিক উদ্দেশ্য না থাকলেও তা গালিতে পরিণত হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যে যুগকে গালি দিল, সে আল্লাহকে গালি দিল। যুগকে গালি দেওয়ার ব্যাপক চাল-চলন জাহেলী যুগে ছিল। আর তাদের এই চাল-চলনের অনুসরণ করল অনেক দুর্বল এবং বুদ্ধি ও বিবেকহীন লোকেরা। যখনই তারা যুগকে তাদের উদ্দেশ্যের প্রতিকুল পায় তখনই তারা তাকে গালি দেয়। কখনো লানতও করে। আর এটা দ্বীনের দুর্বলতা, বিবেকহীনতা এবং অত্যধিক মুর্খতা থেকে সৃষ্টি হয়। যুগের কোনো কিছুই করার শক্তি নেই। কেননা যুগ অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রচালিত। তাতে সংঘটিত হেরফের মহা পরাক্রমশালী ও কৌশলীর পরিচালনার আওতাতেই হয়। তাই (যুগকে গালি দিলে ও দোষারোপ করলে) প্রকৃতপক্ষে গালি ও দোষা-রোপ তার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারীর উপর বর্তায়। আর এতে দ্বীন

কম, বিবেক-বুদ্ধিও হ্রাস পায়, মুসীবত খুব বৃদ্ধি পায় এবং বিপদ এলে তা খুব বড় মনে হয়, ফলে অপরিহার্য সবরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আর এটাই হল তাওহীদ পরিপন্থী জিনিস। তবে যে মু'মিন সে জানে যে, যাবতীয় হেরফের ও অদলবদল আল্লাহর ফয়সালা, তাঁর নির্ধারিত ভাগ্য এবং তাঁর কৌশলের ভিত্তিতে হয়। তাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক দূষিত নয়, সেও তার দোষ বর্ণনা করে না। বরং সে আল্লাহর পরিচালনায় সন্তুষ্ট এবং তাঁর নির্দেশের সামনে নিজেকে নত করে দেয়। আর এরই দ্বারা তার তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে এবং সে নিজেও পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে।

কাযীউল কুযাত ইত্যাদি নামকরণ প্রসঙ্গে

فِي الصحيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ الله، رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ)) قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ.وفي رواية: ((أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ))

সহী হাদীসে আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সব থেকে নিকৃষ্ট নাম ঐ ব্যক্তির নাম, যার 'মালিকুল আমলাক' রাজ্যসমূহের রাজা নামে নামকরণ করা হয়। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কোনো বাদশাহনেই।" সুফিয়ান সাওরী বলেন, যেমন, শাহানশাহ' সম্রাটের সম্রাট নাম রাখা।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই সব চেয়ে বেশী আল্লাহর রোষের শিকার হবে এবং তাঁর নিকট নিকৃষ্টতর গণ্য হবে, যে রাজাধিরাজ নাম ধারণ করে।"

কতিপয় মসলা জানা গেল,
১। রাজ্যসমূহের রাজা নামকরণ নিষেধ।
২। এই ধরনের অর্থ বিশিষ্ট নামও নিষেধ।
৩। এই ব্যাপারে এবং তার অনুরূপ ব্যাপারে যে কঠোরতা, তা নিয়ে বিবেক-বুদ্ধি খাটাতে হবে, যদিও অন্তরে নামের অর্থের নিয়ত হয় না।
৪। এ কথা বুঝে নেওয়া দরকার যে, এই ধরনের উপাধি আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায় হল পূর্বে উল্লিখিত অধ্যায়েরই শাখা। অর্থাৎ, অপরিহার্য কর্তব্য হল, নিয়তে এবং কথা ও কাজে আল্লাহর শরীক স্থাপন না করা। সুতরাং কারো এমন নাম রাখা যাবে না, যাতে আল্লাহর নামসমূহে ও তাঁর গুণাবলীতে কোনো প্রকারের শরীক হয়ে যায়। যেমন, কাযীউল কুযাত (সমস্ত বিচারকের বিচারক), রাজ্যসমূহের রাজা প্রভৃতি নামকরণ। অনুরূপ 'হাকেমুল হুক্কাম' (সমস্ত জজের জজ) অথবা 'আবুল হাকাম' (জজের বাপ) ইত্যাদি নামকরণ থেকেও বাঁচতে হবে। এ সবই হচ্ছে তাওহীদ, আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলীর, সংরক্ষণ এবং শির্কের প্রবেশ পথ বন্ধ করার জন্য। যেন এমন কথা উচ্চারিত না হয়, যাতে শির্কে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর অধি-কারের কোনো কিছুতে কারো শরীক হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়।

মহান আল্লাহর নামসমূহের সম্মান ক'রে নাম পরিবর্তন করা

عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي

شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ؟)) قَالَ لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: ((فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ)) [رواه أبوداود]

আবূ শুরাইহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, তার অপর নাম ছিল 'আবুল হাকাম' (জজের বাপ)। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁকে বললেন, "আল্লাহই তো বিচারপতি এবং তিনিই বিচারের মালিক।" তখন তিনি বললেন, আমার জাতি যখন কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন তারা আমার কাছে ফয়সালা করতে আসে। আমি তাদের ফয়সালা করে দিলে, উভয় দল সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তখন তিনি-ﷺ-বললেন, "এটা তো অতি উত্তম কাজ। তোমার সন্তানাদি কয়টি?" তিনি (আবূ শুরাইহ) বললেন, শুরাইহ, মুসলিম এবং আব্দুল্লাহ। তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে বড় কে?" বললেন, শুরাইহ। তখন আল্লাহর রাসূল-ﷺ-বললেন, "তাহলে তোমার ডাক নাম হল, আবূ শুরাইহ।" (আবূ দাউদ)

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আল্লাহর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলীর মর্যাদা দেওয়া, যদিও তার অর্থ লক্ষ্য না হয়।

২। আল্লাহর নামের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা।

৩। অপর নামের জন্য বড় ছেলেকে নির্বাচন করা।

আল্লাহর যিকর, কুরআন কিংবা রাসূলের সাথে বিদ্রূপ করলে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة ٦٥]

“আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম।” (সূরা তাওবা ৬৫)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بنِ كَعْبٍ وَ زَيْدُ بنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَة، دَخَلَ حَدِيْثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ: ((أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاَءِ. أَرْغَب بُطُوْنـاً، وَلاَ أَكْـذَبَ أَلْسُـناً، وَلاَ أَجْـبَنَ عِنْـدَ اللِّقَـاءِ، يَعْنِـيْ رَسُـوْلَ الله ﷺ وَأَصْحَابَهُ القُرَّاءَ، فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بنِ مَالِكٍ كَذَبْتَ، وَلَكِنَّـكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْـبِرَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ ، فَذَهَبَ عَـوْفٌ إِلَى رَسُـوْلُ الله ﷺ لِيُخْـبِرَهُ، فَوَجَـدَ القُـرْآنَ قَـدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ الله ﷺ، وَقَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَـهُ. فَقَـالَ: يَـا رَسُـوْلَ الله، إِنَّـمَا كُنَّـا نَخُـوْضُ وَنَتَحَـدَّثُ حَـدِيْثَ الرَّكْـبِ نَقْطَـعُ بِـهِ عَنَـاءَ الطَّرِيْقِ، قَالَ ابنُ عُمَرَ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَتَعَلِّقاً بِنَسْعَةِ نَاقَةِ رَسُـوْلِ الله ﷺ، وَإِنَّ الحِجَارَةَ تَنْكُـبُ رِجْلَيْـهِ، وَهُـوَ يَقُـوْلُ: إِنَّـمَا كُنَّـا نَخُـوْضُ وَنَلْعَـبُ. فَيَقُـوْلُ لَـهُ رَسُوْلُ الله ﷺ :﴿ أَبِا الله وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ﴾مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَمَـا يَزِيْدُهُ))

ইবনে উমর, মুহাম্মাদ ইবন কাআ’ব, যায়েদ ইবনে আসলাম এবং ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণিত, তাঁদের পরস্পরের কথায় মিলও আছে, তাবুক যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি এই কথা-বার্তা বলতে লাগল যে, আমাদের এই ক্বারীদের মত বড় পেটওয়ালা, কথায় বড় মিথ্যুক এবং যুদ্ধের সময় অত্যধিক ভীরু আর কাউকে দেখেনি। তার লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহ-ﷺ-

এবং তাঁর ক্বারী সাহাবীগণ। তখন আউফ ইবনে মালিক তাকে বলল, তুমি মিথ্যুক এবং মুনাফেক। আমি অবশ্যই এ কথা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জানাব। অতঃপর আউফ এই খবর দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট গেলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেই কুরআন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে এ খবর জানিয়ে দিয়েছে। উক্ত ব্যক্তিও তার উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট এসে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পথ অতিক্রম করার জন্য আপসে হাসি ঠাট্টা এবং কাফেলা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ইবনে উমার-ﷺ-বলেন, আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে আছি যে, কেমন করে সে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উষ্ট্রীর রসির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কথা বলছে। আর পাথর উড়ে উড়ে তার পাকে স্পর্শ করছিল। সে বলছিল, আমরা হাসি-ঠাট্টা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নির্দশনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ। আর এই অবস্থায় তিনি-ﷺ-সেই মুনাফেকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপও করেননি এবং তাঁর উল্লিখিত কথার অধিকও কিছু বলেননি।"

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। বড় বিষয় হল, যে ব্যক্তি কুরআন ইত্যাদির সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, সে কাফের।

২। এটাই আয়াতের ব্যাখ্যা যে, যারই কার্যকলাপ এ রকম হবে, সে কাফের।

৩। চুগলী করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিমিত্তে নসীহত করার মধ্যে পার্থক্য।

৪। কোনো কোনো ওজর-আপত্তি এমনও হয়, যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ অথবা কুরআন কিংবা রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হল, পূর্ণ ঈমান বিরোধী এবং দ্বীন থেকে বহিষ্কারকারী জিনিস। কারণ, দ্বীনের মূল হল, আল্লাহ, তাঁর গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনা। আর এ সবের সম্মান প্রদর্শনও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর এ কথা সুবিদিত যে, উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফরীর থেকেও সাংঘাতিক। কারণ, এতে কুফরীর সাথে সাথে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য মনে করাও বিদ্যমান থাকে। কেননা, কাফেররা দুই প্রকারের। (১) অগ্রাহ্যকারী (২) অগ্রাহ্যকারী ও তর্ককারী। যে অগ্রাহ্যের সাথে সাথে তর্ক ও প্রতিবাদও করে, সে হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রামকারী। আল্লাহ, তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রাসূল সম্পর্কে কটুক্তিকারী। আর এটাই হল, জঘন্য কুফরী ও বড় ফ্যাসাদ। আর দ্বীনের কোনো কিছুর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এই প্রকারেরই জিনিস।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ [فصِّلت:٥٠]

“বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার যোগ্য প্রাপ্য।” (সূরা ফুসসিলাত ৫০) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হল, এটা আমার আমলের প্রতিদান এবং আমি এর হকদার। আর ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-বলেন, তার উদ্দেশ্য হল, এটা আমার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ [القصص:٧٨]

"সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।" (সূরা ক্বাসাস ৭৮) ক্বাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, আমি উপার্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি জানি। অন্যরা বলেছেন, এর অর্থ, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, আমি এর যোগ্য। মুজাহিদের কথার তাৎপর্য এটাই যে, আমার মান-মর্যাদার ভিত্তিতে আমাকে এটা দেওয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله ﷺ يقول: ((إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْإِبِلُ أَوْ الْبَقَرُ-شَكَّ إِسْحَقُ- فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْبَقَرُ أَوِ الإِبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ

وَوَلَّدَ هَذَا قَالَ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِالله ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا، أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِالله ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَالله لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لله، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ)) [أخرجاه]

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, “বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে একজন কুষ্ঠ রোগী, একজন টাকপড়া রোগী এবং একজন অন্ধ ছিল। তাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তাই একজন ফেরেশতাকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

প্রথমে কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, কোন্ জিনিসটি তোমার নিকট সব থেকে বেশী প্রিয়? সে বলল, উত্তম রঙ ও উত্তম চামড়া এবং আমার থেকে ঐ জিনিস দূর হয়ে যাক, যার জন্য লোকে আমাকে ঘৃণা করে। (আবূ হুরাইরা) বলেন, ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার থেকে সেই ঘৃণিত জিনিস দূর হয়ে গেল। আর আল্লাহ তাকে উত্তম রঙ ও উত্তম চামড়া দান করলেন। আবূ হুরাইরা বলেন, অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ মাল তোমার নিকট সব থেকে প্রিয়? সে বলল, উট, অথবা গারু-ইসহাকের এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে। তখন তাকে দশ মাসের গাভিন উটনী দেওয়া হল। আর বললেন, আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর টাকপড়া রোগীর নিকট গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট সব থেকে বেশী প্রিয়? সে বলল, উত্তম কেশ এবং আমার থেকে ঐ জিনিস দূর হয়ে যাক, যার জন্য লোকে আমাকে ঘৃণা করে। তখন তিনি তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে, তার রোগ দূর হয়ে গেল এবং আল্লাহ তাকে উত্তম কেশ দান করলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ মাল তোমার নিকট সব থেকে বেশী প্রিয়? সে বলল, গরু অথবা উট। তখন তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং বলেন, আল্লাহ তোমাকে তাতে বরকত দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর অন্ধের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট সব থেকে বেশী প্রিয়? সে বলল, আমার কাছে প্রিয় হল এই যে, আল্লাহ আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন। যাতে লোকদের দেখতে পারি। তখন ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ মাল তোমার নিকট সব থেকে বেশী প্রিয়? সে বলল, ছাগল। ফলে তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেওয়া হল। উট, গরুও বাচ্চা জন্ম দিল এবং ছাগলও বাচ্চা দিল। ফলে একজনের গোয়াল

ভতরি উট, আর একজনের গোয়াল ভরতি গরু এবং একজনের গোয়াল ভরতি ছাগল হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর নিকট তারই রূপ ধারণ করে এসে বললেন, আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি। আমার সফরের সামান শেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহর সাহায্য অতঃপর তোমার সহযোগিতা ব্যতীত আমি গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারব না। কাজেই সেই আল্লাহর নামে একটি উট কামনা করছি, যিনি তোমাকে উত্তম রঙ, উত্তম চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। সে বলল, আমার অনেক হকদার আছে। তখন তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে চিন্তে পেরেছি। তুমি কি এমন একজন কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র ছিলে না যে, যাকে দেখে লোকে ঘৃণা করত? পরে মহান আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেন? সে বলল, আমি এই সম্পদ বংশানুক্রমে উত্তরা-ধিকার সূত্রে লাভ করেছি। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্বের ন্যায় বানিয়ে দেন। অতঃপর টাক পড়া রোগীর নিকটও তার মত হয়ে গেলেন, তাকেও অনুরূপ বললেন। সেও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় উত্তর দিল। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে আগের ন্যায় বানিয়ে দেন। তারপর অন্ধ সেঝে অন্ধের নিকট এসে বললেন, আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি। আমার সফরের সামান শেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহর সাহায্য অতঃপর তোমার সহযোগিতা ব্যতীত আমি গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারব না। কাজেই সেই আল্লাহর নামে একটি ছাগল কামনা করছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তখন সে বলল, আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তোমার যতটা ইচ্ছা নিয়ে যাও, যতটা ইচ্ছা ছেড়ে যাও। আল্লাহর শপথ তুমি আজ আল্লাহর নামে যা কিছু নিবে, আমি তাতে বাধা প্রদান করব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমিই রাখ। তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলে।

আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার দুই সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট।” (বুখারী-মুসলিম)

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আয়াতের তাফসীর।

২। ‘অবশ্যই বলবে এটা আমার প্রাপ্য’ কথার ব্যাখ্যা।

৩। ‘আমি তা আমার জ্ঞানের দ্বারা লাভ করেছি’ কথার ব্যাখ্যা।

৪। বিস্ময়কর এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে মহৎ উপদেশাবলী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হল, যারাই নিয়ামত ও রুজি লাভ করে, তারা যেন এই মনোভাব পোষণ না করে যে, তারা এসব প্রাপ্ত হয়েছে আপন প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধির বদৌলতে অথবা তারা এর যোগ্য, তাদের নাকি আল্লাহর উপর অধিকার রয়েছে। কারণ, এ সবই তাওহীদ পরিপন্থী জিনিস। প্রকৃত মু’মিন যে হয়, সে আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামতকে স্বীকার ক’রে তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে, তাকে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার সাথে সম্পর্কিত করে এবং তার দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে সাহায্য গ্রহণ করে। সে মনে করে না যে, এগুলো তার আল্লাহর উপর প্রাপ্য অধিকার ছিল। বরং সমস্ত অধিকারই হল আল্লাহর। সে তো সব দিক দিয়েই আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা। আর এরই দ্বারাই ঈমান ও তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। আর এর বিপরীত মনোভাবে নিয়ামতের অকৃজ্ঞতা স্বাব্যস্ত হয়। আত্মগর্ব ও আত্মাভিমানই সব থেকে বড় দোষ।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحٗا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ﴾ [الأعراف:١٩٠]

"অতঃপর আল্লাহ যখন তাদের উভয়কে সুসন্তান দান করলেন, তখন তারা উভয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুতে তাঁর অংশীদার স্থাপন করল।" (সূরা আ'রাফ ১৯০)

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, (কুরআন ও হাদীসের বিশারদগণ) এ ব্যাপারে একমত যে, এমন শব্দযোগে নাম রাখা হারাম, যার অর্থ দাঁড়ায় দাস। যেমন, আব্দে উমার (উমারের দাস) এবং আব্দুল কা'বা (কা'বার দাস)। তবে আব্দুল মুত্তালিব এর ব্যতিক্রম।

ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলনে, যখন আদম-عليه السلام-হাওয়া (আলাইহা সাল্লাম)-এর সাথে সঙ্গম করেন, তখন তিনি গর্ভবতী হয়ে যান। অতঃপর ইবলীস তাঁদের নিকট এসে বলে, আমি তোমাদের সে-ই সঙ্গী-আমিই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর, না হলে আমি বাচ্চার উটের মত দু'টি শিং বানিয়ে দিব। ফলে সে তোমার পেট ফেড়ে বের হবে। আর আমি এ কাজ অবশ্যই করব। সে তাঁদেরকে ভয় দেখাল। সে বলল, বাচ্চার নাম আব্দুল হারিস রাখ। তাঁরা তার কথা মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে বাচ্চা মৃত হল। অতঃপর পুনরায় তিনি গর্ভবতী হলেন। পুনরায় ইবলীস তাঁদের নিকট এসে অনুরূপ বললে, তাঁদের মধ্যে শিশুর ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই তাঁরা শিশুর নাম আব্দুল হারিস রাখেন। আল্লাহর এই বাণী 'তখন আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুতে তাঁর অংশীদার স্থাপন করল।' তাৎপর্য এটাই। (ইবনে হাতিম)

ইবনে হাতিমই সহী সনদে ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, শরীকরা ছিল অনুসরণের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল না।

ইবনে হাতিম সহী সনদে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'অতঃপর তাদেরকে যখন সুসন্তান দান করা হল' কথার তাৎপর্য হল, পিতা-মাতার ভয় ছিল, শিশুটা মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হয়ে যায়। হাসান ও সাঈদ প্রভৃতি থেকেও উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে অনুরূপ উক্তি সংকলিত হয়েছে।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। অন্যের দাস অর্থ বিশিষ্ট নাম হারাম।

২। আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩। এই শির্ক শুধু নামকরণে, যার প্রকৃতার্থ লক্ষ্য হয় না।

৪। আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে সুস্থ কন্যা দান করলে, তাও নিয়ামত।

৫। পূর্বের বিদ্যানগণের অনুসরণে শির্ক এবং ইবাদতে শির্কের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল, মহান আল্লাহ সন্তান দান ক'রে যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তাদেরকে শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা দান করে তাঁর নিয়ামত তাদের উপর পরিপূর্ণ করেছেন এবং এই নিয়ামতের পরিপূরক হিসাবে তাদেরকে দ্বীনদার বানিয়েছেন, তাদের কর্তব্য হলো, নিয়ামতের আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, সন্তানদেরকে গায়রুল্লাহর ইবাদতের ভিত্তিতে গঠন না করা এবং তাঁর অনুগ্রহকে গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত না করা। কারণ, এতে নিয়ামতের না-শুকরী হয় এবং তাওহীদ পরিপন্থীও বটে।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে।" (সূরা আ'রাফ ১৮০) ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে উল্লেখ করেছেন যে, 'ইউলহেদুনা ফী আসমায়েহি' (তারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে) কথার অর্থ হল, তারা (তাঁর নামের সাথে) শির্ক করে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, তারা 'লাত'-এর নাম 'ইলাহ' থেকে এবং 'উযযা'র নাম 'আযীয' থেকে রেখেছে। আ'মাশ থেকে এসেছে যে, আয়াতের তাৎপর্য হল, আল্লাহর নামের মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দেয়, যা তাঁর নামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আল্লাহর নামসমূহের প্রমাণ।

২। তা উত্তম হওয়ার প্রমাণ।

৩। তাঁর নাম ধরে দুআ করার নির্দেশ।

৪। জাহেল ও বে-দ্বীনদের মধ্যে যারা তাঁর নামের বিরোধিতা করে, তাদের বর্জন করা।

৫। আয়াতে উল্লিখিত ইলহাদের ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তাওহীদের মূল হল, আল্লাহ তাঁর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে যা তিনি নিজের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠা

করেছেন, তার প্রতিষ্ঠা করা। আর এই নামসমূহের মধ্যে যে সুমহান অর্থ এবং উত্তম তত্ত্ব বিদ্যমান রয়েছে, তার জ্ঞানার্জন করা, তার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা এবং ঐ নামের অসীলায় তাঁর নিকট দুআ করা। বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়সমূহের মধ্যে যা কিছু কামনা করে, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে তার চাহিদা উপযোগী নামের অসীলায় দুআ করা উচিত। যেমন, যে রুজি চায়, সে তাঁর 'রাযযাক্ব' নামের অসীলায় দুআ করবে। আর যে রহমত ও ক্ষমা কামনা করে, সে 'আররাহীম, আররাহমান, আল গাফুর, আত্তাওয়াব' নামের অসীলায় দুআ করবে। তবে উত্তম হল, ইবাদতের দুআ আল্লাহর সুন্দর নাম ও তাঁর গুণাবলী দ্বারা করা। আর এটা করতে হবে তাঁর সুন্দর নামসমূহের অর্থগুলো ও তার তাৎপর্যগুলো অন্তরে উপস্থিত রেখে। যাতে অন্তর তার দাবী ও প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং বহু সুমহান তত্ত্বে অন্তর ভরে যায়। যেমন, যে নামের অর্থ হয় মহান, মহিমময়, গৌরবময় এবং যে নামে ভীতির সৃষ্টি হয়, সেই নাম নেওয়ার সময় তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্যে অন্তর ভরে যাবে। আর যে নামের অর্থ হয়, সুন্দর, কল্যাণকারী, অনুগ্রহকারী, রহমকারী এবং বদান্য, সেই নাম নেওয়ার সময় তাঁর প্রতি ভালবাসায়, আগ্রহে এবং তাঁর প্রশংসায় ও কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে যাবে। আর যে নামের অর্থ হয়, পরাক্রমশীল, কৌশলী এবং মহা জ্ঞানী ও শক্তিশালী, সেই নাম নেওয়ার সময় অন্তর ভরে যাবে তাঁর প্রতি বিনয়, ভীতি এবং তাঁর সামনে নতস্বীকারে। আর যে নামের অর্থ হয়, অবহিত, পরিব্যাপ্ত, পর্যবেক্ষক এবং পরিদর্শক, সেই নাম নেওয়ার সময় চলাফেরায় ও উঠাবসা সর্ব ক্ষেত্রে অন্তর জাগ্রত থাকবে এই খেয়ালে যে আল্লাহই পর্যবেক্ষক। ফলে জঘন্য চিন্তা-ভাবনা

ও নোংরা ইচ্ছা অন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যে নামের অর্থ হয়, মুখাপেক্ষীহীন ও দয়ালু, সেই নাম নেওয়ার সময় অন্তরে এই খেয়াল জেগে উঠবে যে, বান্দা তাঁর মুখাপেক্ষী। তাই প্রয়োজনে এবং সব সময় ও সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।

আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলীর জ্ঞান অর্জন ও তার দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করার কারণে বান্দার অন্তরে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, দুনিয়াতে এর থেকে উত্তম, শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণ অনুভূতি আর হয় না। এটা আল্লাহর উত্তম দান। যাতে বান্দা তাঁর উপাসনা করে। এটাই হলো, তাওহীদের প্রাণ। যার জন্য আল্লাহ এই দরজা খুলে দেন, তার জন্য নির্মল তাওহীদ এবং পূর্ণ ঈমানের দরজাও খুলে দেন, যা খুব কম সংখ্যক তাওহীদ-বাদীদের ভাগ্যে জুটে। তবে আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলীর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সৌভাগ্য লাভ করা যায়। তাই আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলীর ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করা বা তা বর্জন করা হলো এই মহান লক্ষ্যের পরিপন্থী ও কট্টর বিরোধী জিনিস। আর বর্জন ও বাঁকা পথ অবলম্বন করণ কয়েকভাবে হয়। যেমন, বর্জনকারীর (আল্লাহর নামের ও তাঁর গুণাবলীর) সমস্ত অর্থকে অস্বীকার করা। যেমন জাহমিয়া ও তাদের অনুসারীরা করে। কিংবা আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা। যেমন, রাফেযাহ প্রভৃতিরা করে। অথবা তাঁর নামে কোনো সৃষ্টির নাম রাখা। যেমন, মুশরিকরা করে। তারা 'লাত' এবং 'উযযাহ' ও 'মানাত' নাম রেখেছিল, যা 'ইলাহ' এবং 'আযীয' ও 'মান্নান' শব্দ থেকে গঠিত। তারা এই নামগুলো আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ থেকে বের করে আল্লাহর সাথে তার তুলনা করেছে। অতঃপর ইবাদত, যা আল্লাহর বিশেষ অধিকারগুলোর অন্যতম, তা তাদের জন্যও নির্ধারিত

করেছে। সুতরাং আল্লাহর নামসমূহকে বর্জন করার প্রকৃত অর্থ হল, তাকে তার প্রকৃত লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ফিরানো। তাতে তা শাব্দিক হোক অথবা অর্থের দিক দিয়ে হোক কিংবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে হোক বা পরিবর্তন সুচিত ক'রে হোক। আর এ সবই তাওহীদ ও ঈমান পরিপন্থী বিষয়।

'আসসালামু আ'লাল্লাহ' বলা যায়া না

فِي الصَّحِيْحِ عَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَام))

সহী হাদীসে ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম-ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম, তখন বলতাম, আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষণ হোক। অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষণ হোক, তখন নবী করীম-ﷺ-বললেন, আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষণ হোক, এ কথা বলো না। কারণ, আল্লাহই শান্তিদাতা।

কতিপয় মসলা জানা গেল

১। সালামের ব্যাখ্যা।

২। তা হলো সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

৩। তা আল্লাহর শানে বলা ঠিক নয়।

৪। ঠিক না হওয়ার কারণ।

৫। তাদেরকে সঠিক সালামের শিক্ষা প্রদান।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষণ হোক, এ কথা কেন বলা যাবে না তা নবী করীম-ﷺ-তাঁর এই বাণী, কারণ, তিনিই শান্তিদাতা' দ্বারা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা শান্তিদাতা। তিনি সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং সৃষ্টির কেউ তাঁর মত হবে, এ থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেন। সুতরাং বান্দারা তাঁর অনিষ্ট করতে চাইলে, তা তারা পারবে না এবং তাঁর কোনো উপকার করতে চাইলে, তাও পারবে না। বরং বান্দারা তাদের সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর প্রয়োজন বোধ করে। তিনি তো প্রশংসিত ও মুখাপেক্ষিহীন।

হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, এ কথা প্রসঙ্গে

فِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمْ المَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ)) ولمسلم: ((وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ))

সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ কথা না বলে যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার ইচ্ছা হলে আমার উপর রহম কর। বরং তাকে আল্লাহর নিকট দৃঢ়তার সাথে চাইতে হবে। কেননা, আল্লাহকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।" আর মুসলিম শরীফে আছে, "মানুষের উচিত বড় আগ্রহের সাথে আল্লাহর নিকট চাওয়া। কারণ, তিনি যা কিছু দিবেন, তার কোনোটাই তাঁর নিকট বড় নয়।'

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

যাবতীয় বিষয় আল্লাহর ইচ্ছা-ইরাদার উপর নির্ভরশীল হলেও দ্বীনি ব্যাপারে যেমন, রহমত, ক্ষমা, দ্বীনের কাজে সাহায্য কামনা সহ আরো অন্যান্য পার্থিব বিষয় ও রুজি ইত্যাদি চাওয়ার ব্যাপারে বান্দাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে স্বীয় প্রতি-পালকের নিকট তা কামনা করে। আর এই চাওয়াই হল মুখ্য ইবাদত ও তার প্রধান কাজ। আর ইচ্ছার-ইরাদার সাথে না জড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে না চাওয়া পর্যন্ত এটা (ইবাদত) পূরণ হবে না। কেননা, (বান্দাকে) এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কেবল কল্যাণই থাকে, কোনো ক্ষতি থাকে না। আর আল্লাহ কোনো জিনিসকে বড় মনে করেন না। এতে এই চাওয়া এবং নির্দিষ্ট করে কোনো এমন কিছু চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয়ে গেল, যার উদ্দেশ্য ও উপকার বাস্তবায়িত হয় না। আবার এটাও নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না যে, তা পেলে বান্দার জন্য কল্যাণকর হবে। তাই বান্দা তার প্রতিপালকের নিকট চাইবে এবং তার জন্য কোনোটা বেশী ভাল, তার নির্বাচন তার রবের উপর ছেড়ে দিবে। যেমন, প্রমাণিত এই দুআ পড়া,

((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي))

"হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যদি জীবনই আমার জন্য উত্তম হয়। আর আমাকে মৃত্যু দান কর, যদি মনে কর যে মৃত্যুই আমার জন্য শ্রেয়।" অনুরূপ ইস্তিখারা বা কল্যাণ কামনার দুআ পাঠ করা। ক্ষতি নেই এমন উপকারী জিনিস কামনা করার ব্যাপারে এবং যার উপকার সুবিদিত তা চাওয়ার ব্যাপারে বান্দা নিজের ইচ্ছা-ইরাদার সাথে সম্বন্ধ করে না। অনুরূপ যার পরিণাম সম্পর্কে বান্দা অজ্ঞ, যার ক্ষতির দিক বেশী, না উপকারের দিক বেশী, তাও সে জানে না, এ সব কিছুর নির্বাচন সে

তার সেই রবের উপর ছেড়ে দেয়, যাঁর জ্ঞান, কুদরত এবং রহমত ও দয়া প্রত্যেক জিনিসকে পরিব্যাপ্ত।

আমার দাস আমার দাসী বলবে না

فِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي))

সহী হাদীসে আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “তোমারা কেউ এইরূপ বলবে না যে, তোমার প্রভুকে খাওয়াও, তোমার প্রভুকে অযূ করাও, বরং দাস বা দাসীরা (তাদের মালিককে) বলবে, আমার সর্দার ও আমার নেতা। আর তোমাদের কেউ যেন দাসদাসীদেরকে এরূপও না বলে যে, আমার দাস ও আমার দাসী, বরং বলবে, আমার ছেলেটা বা মেয়েটা কিংবা আমার কাজের ছেলে।”

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আমার দাস ও দাসী বলা নিষেধ।

২। চাকর তার মুনিবকে আমার রব্ব বলবে না এবং তাকেও বলা যাবে না যে, তোমার রব্বকে আহার করাও।

৩। অপরকে আমার মুনিব ও আমার সর্দার বলা শিক্ষা দেওয়া।

৪। এখানে আসল উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা হল, ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাওহীদের শিক্ষা প্রদান।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বান্দার আমার দাস ও দাসী বলার পরিবর্তে, আমার ছেলেটা ও মেয়েটা বলা মুস্তাহাবের পর্যায় পড়ে। আর এটা অন্য নিষিদ্ধ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন শব্দ থেকে বাঁচার জন্য, যদিও তা অনেক দূর থেকেও হয়। তবে এটা হারাম নয়। বরং এটা সুন্দর শব্দ থেকে নিষিদ্ধ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কথা থেকে পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা, কথা ও শব্দের মধ্যে আদব বজায় রাখা হল, পূর্ণ তাওহীদের দলীল। বিশেষ করে এই ধরনের শব্দ, যাতে অন্য ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভানা বেশী।

যে আল্লাহর নিকট চায়, সে প্রত্যাখ্যাত হয় না

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ))

[رواه أبوداود والنسائي بسند صحيح]

ইবনে উমার-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে চায়, তাকে দাও। যে আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের নিকট আশ্রয় কামনা করে, তাকে আশ্রয় দাও। যে তোমাদের নিকট আবেদন করে, তার আবেদনে সাড়া দাও। যে তোমাদের জন্য ভাল করে, তোমরা তার প্রতিদান দাও। যদি তোমাদের নিকট প্রতিদান দেওয়ার মত কিছু না থাকে, তবে তার জন্য এমনভাবে দুআ কর যাতে তোমাদের মনে হয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।" (হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী সহী সনদে বর্ণনা করেছেন)।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আল্লাহর নামে আশ্রয় কামনা করলে, আশ্রয় দেওয়া।

২। যে আল্লাহর নামে চায়, তাকে দেওয়া।

৩। আবেদন রাখলে, তা কবুল করা।

৪। ভাল কাজের প্রতিদান দেওয়া।

৫। সে দুআ দিয়ে প্রতিদান দিবে, যার কাছে অন্য কিছু নেই।

৬। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী, "যেন তোমাদের মনে হয় যে, তোমরা প্রতিদান দিতে পেরেছ।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হল সেই ব্যক্তি, যার নিকট চাওয়া হয়। অর্থাৎ, কেউ যদি কোনো মানুষের নিকট সর্বোচ্চ ও সুমহান অসীলা ধরে চায়, যেমন, আল্লাহর অসীলায়, তাহলে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং যে ভাই এই বড় মাধ্যম ধরে চায়, তার অধিকার পূরণ করার জন্য তাকে দেওয়া উচিত।

আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া যায় না

عَنْ جَابِرٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لاَيُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الجَنَّةَ))

জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া যায় না।" (আবূ দাউদ)

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া নিষেধ।

২। আল্লাহর 'অজহ' (মুখমণ্ডল) এর প্রমাণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হল সেই ব্যক্তি, যে চায়। তার কর্তব্য হল, আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলীর সম্মান প্রদর্শন করবে। তাঁর দোহাই দিয়ে দুনিয়ার কোনো কিছু চাইবে না। বরং তাঁর দোহাই দিয়ে কেবল অত্যধিক প্রয়োজনীয় জিনিস এবং মহান বস্তুই কামনা করবে। আর তা হল, জান্নাত এবং তার চিরন্তন সম্পদ। আর কামনা করবে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি, তাঁর মুখমণ্ডলের দর্শণ এবং তাঁর সাথে কথাপোকথনের দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ। এই মূল্যবান সম্পদই আল্লাহর দোহাই দিয়ে কামনা করা যায়। আর পার্থিব জীবনের নগণ্য জিনিস যদিও বান্দা তার প্রতিপালকের নিকটই তা কামনা করতে চায়, তবুও তা তাঁর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে কামনা করবে না।

'যদি' কথা প্রসঙ্গে

আল্লাহর বাণী,

﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾ [آل عمران:١٥٤]

"তারা বলে, আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।" (আল ইমরান ১৫৪) তিনি আরো বলেন,

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران:١٦٨]

"ওরা হল এমন লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, (যারা লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে) যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তাহলে নিহত হত না।" (সূরা আল ইমরান ১৬৮)

فِي الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))

সহী হাদীসে আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিষে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত। বরং বল, আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন। কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা আলে-ইমরানের দু'টি আয়াতের তাফসীর।

২। কোনো বিপদ এলে 'যদি এই রকম করতাম' বলা পরিষ্কার নিষেধ।

৩। আর এই নিষেধের কারণ হল, এতে শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে যায়।

৪। ভাল কথার শিক্ষা প্রদান।

৫। আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষাসহ উপকারী বিষয়ের যত্ন নেওয়ার নির্দেশ।

৬। এর পরিপন্থী বিষয় থেকে নিষেধ প্রদান। আর তা হল, উৎসাহহীন হওয়া।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জেনে রাখবে, বান্দার 'যদি' শব্দ ব্যবহার করা দুই প্রকারের, (১) নিন্দনীয় (২) প্রশংসনীয়। নিন্দনীয় হল, তার দ্বারা অপছন্দনীয় কোনো কিছু ঘটলে অথবা তার উপর কোনো কিছু আপতিত হলে বলা, আমি যদি এই রকম করতাম, তাহলে এই রকম হত। এটা হল শয়তানের কাজ। কারণ, এর মধ্যে দু'টি নিষিদ্ধ জিনিস বিদ্যমান থাকে। (১) এতে তার জন্য অনুতপ্ত, অসন্তুষ্টি এবং দুঃখ-পরিতাপের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়, যা তার উচিত বন্ধ রাখা। আর এতে কোনো উপকারও নেই। (২) এতে আল্লাহ ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের সাথে অশিষ্টতা করা হয়। কারণ, যাবতীয় বিষয় এবং ছোট-বড় সমস্ত ঘটন-অঘটন আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের ভিত্তিতেই হয়। যা ঘটার, তা ঘটবেই। তা রোধ করা সম্ভব নয়। তাই কেউ যদি বলে, যদি এ রকম হত, বা যদি এরকম করতাম, তাহলে এ রকম হত, তবে তাতে এক প্রকার প্রতিবাদ এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে দুর্বলতার প্রকাশ পায়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যতক্ষণ না বান্দা এই দু'টি নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান ও তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করবে না। আর প্রশংসনীয় হল,

কোনো বান্দার কল্যাণের আশা ক'রে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী,

((لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَأَهْلَلْتُ بِالعُمْرَةِ))

"যা আমি পরে জানলাম, তা যদি পূর্বে জানতাম, তাহলে 'হাদী' তথা কুরবানীর পশু সাথে করে আনতাম না এবং উমরার নিয়ত করতাম।" অনুরূপ নিজের কল্যাণ লাভের আশায় এইভাবে বলা, যদি আমারও অমুকের মত সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি ওর মত করতাম। 'যদি ভাই মূসা সবর করতেন, তহলে তাঁদের আরো অনেক বিষয় আল্লাহ আমাদেরকে জানাতেন।' সুতরাং কল্যাণের আশায় 'যদি' বললে, তা প্রশংসনীয়। আর অকল্যাণের কারণে বললে, তা নিন্দনীয়। তাই 'যদি' ব্যবহার করার ভাল-মন্দ নির্বাচিত হবে তার অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে। তাই তার ব্যবহার যদি কোনো সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ঈমানের দুর্বলতা অথবা অকল্যাণের কারণে হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় হবে। আর যদি তার ব্যবহার কল্যাণের প্রতি আগ্রহ এবং কোনো কিছুর শিক্ষা দেওয়ার জন্য হয়, তাহলে তা প্রশংসনীয় হবে।

বায়ুকে গালি দেওয়া নিষেধ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ)) [صحيح الترمذي]

উবায় ইবনে কা'ব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। যদি অবাঞ্ছনীয় কোনো কিছু দেখ, তাহলে বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই বায়ুর এবং যা তার মধ্যে নিহিত ও তা যার আদেশপ্রাপ্ত তার কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই বায়ুর এবং তাতে নিহিত অনিষ্ট থেকে ও তা যার আদেশপ্রাপ্ত তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।" (ইমাম তিরমিযী হাদীসটি সঠিক বলেছেন)।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। বায়ুকে গালি দেওয়া নিষেধ।

২। মানুষ অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, উপকারী জিনিসের দিকে পথনির্দেশ।

৩। বায়ু যে আদেশপ্রাপ্ত তার শিক্ষা দেওয়া।

৪। বায়ুকে কখনো কল্যাণের এবং কখনো অকল্যাণের আদেশ দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এটা যুগকে গালি দেওয়ার মতনই ব্যাপার। আর এ কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তবে পার্থক্য হল, ঐ অধ্যায় যুগের সমস্ত কিছুকে গালি দেওয়ায় পরিব্যাপ্ত ছিল। আর এই অধ্যায়ে নির্দিষ্ট করে বায়ুকে গালি দেওয়ার কথা বলা হয়েছ। এটা হারাম এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ। কারণ, বায়ু মহান আল্লাহর পরিচালনায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই তাকে গালি দিলে, সে গালি তার পরিচালকের উপর বর্তাবে। তবে অধিকান্তু বায়ুকে গালি দেওয়ার সময় গালি-দাতার অন্তরে যেহেতু এই অর্থ (গালি আল্লাহর উপর বর্তায়) থাকে না, তা নাহলে ব্যাপার আরো কঠিন হত। কিন্তু আসলে এই মনে করে কোনো মুসলিম গালি দেয় না।

অধ্যায়
আল্লাহর বাণী

﴿يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لله﴾ [آل عمران:١٥٤]

"আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মুর্খদের মত। তারা বলছিল, আমাদের হাতে কি কিছু নেই? তুমি বল, সব কিছুই আল্লাহর হাতে।" (সূরা আল ইমরান ১৫৪) তিনি আরো বলেন,

﴿الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦]

"যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্য মন্দ পরিণাম।" (সূরা ফাতহ ৬)

ইবনে কাইয়ূম (রহঃ) প্রথম আয়াতটি সম্পর্কে বলেন যে, এর ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের সহযোগিতা করবেন না এবং তাঁর ব্যাপার আরো দুর্বল হয়ে যাবে। আর এও বলা হয়েছে যে, তাঁকে যা কিছু পৌঁছে, তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও তাঁর কৌশলের ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ, তিনি (ইবনে কাইয়ূম) ব্যাখ্যা করেছেন যে, তারা (মুনাফেকরা) আল্লাহর হিকমত ও তাঁর শক্তি অস্বীকার করেছে এবং এ কথারও অস্বীকার করেছে যে, তাঁর রাসূলের কার্যকলাপ পূর্ণতা লাভ ও তাঁর দ্বীন অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয় লাভ করবে। আর এটাই হল, খারাপ ধারণা, যা মুশরিকরা ও মুনাফেকরা পোষণ করত। আর এই ধারণা এই জন্য ছিলো যে, তারা মহান আল্লাহর ব্যাপারে এমন চিন্তা-ভাবনা করত, যা প্রশংসানীয় ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর জন্য উপযুক্ত

নয় এবং তাঁর সত্যিকার অঙ্গীকারের সামনে এই রকম মনে করাও উচিত নয়। সুতরাং যে এই ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ মিথ্যাকে সত্যের উপর সময়ের জন্য বিজয় দান করবেন। ফলে সত্য দুর্বল হয়ে যাবে অথবা মনে করে যে, যা কিছু হয় এগুলো তাঁর ফয়সালা ও তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের ভিত্তিতে নয় কিংবা মনে করে যে, আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণ তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তি নয় যে, তিনি এর জন্য প্রশংসার অধিকারী হতে পারেন, বরং তা তাঁর খেয়াল-খুশীর ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে, এ সবই হল কাফেরদের ধারণা। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, অর্থাৎ, জাহান্নাম।

অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হল, তাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং অন্যদের জন্যও তিনি যা করেছেন, সে ব্যাপারে তারা তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। এ থেকে কেবল সেই নিরাপদ, যে আল্লাহ, তাঁর নামসমূহ, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসার দাবী সম্পর্কে জানে। অতএব নিজের মঙ্গলকামী সকল বুদ্ধিজীবীর উচিত উল্লিখিত ব্যাপারটির গুরুত্ব দেওয়া এবং স্বীয় প্রতিপালকের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আল্লাহর নিকট এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। যদি তুমি খোঁজ কর, তাহলে দেখবে যে, অনেকেই ভাগ্যের ব্যাপারে খুবই কঠোর ও তাকে তিরস্কার ক'রে বলে, এ রকম বা ঐ রকম হওয়া উচিত ছিল। এতে কেউ কিছু কম করে বলে, আবার কেউ বেশী করে বলে। তুমি ভেবে দেখ, তুমি কি এই মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে আছ? আরবীতে একটি কবীতা আছে যার অর্থ হল, যদি তুমি (মন্দ ধারণা থেকে) বেঁচে গিয়ে থাক, তাহলে তুমি বিরাট জিনিস থেকে বেঁচে গিয়েছ। অন্যথায় আমি মনে করি না যে, তুমি বেঁচে গেছ।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা আল-ইমরানের আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা ফাতহ-এর আয়াতের তাফসীর।

৩। এই ব্যাপারগুলো অসংখ্য প্রকারের।

৪। যে আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী এবং নিজের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, সে ব্যতীত কেউ সুরক্ষিত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

'আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা ছিল মুর্খদের মত।' অর্থাৎ, বান্দার ঈমান ও তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে না, যতক্ষণ না সে, আল্লাহর নামসমূহ, তাঁর গুণাবলী ও তিনি তাঁর পূর্ণ সত্ত্বা সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। তাঁর খবর দেওয়া সব কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। দ্বীনের সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর অঙ্গীকার যে সত্য, তা মেনে না নিবে এবং সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা না ভাববে। কেননা, এই সবের উপর বিশ্বাস ও তার প্রতি তুষ্টতা হল, ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যে ধারণাই এর বিরোধিতা করবে, তা জাহেলী যুগের তাওহীদ পরিপন্থী ধারণা বিবেচিত হবে। কারণ, তা হল আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা, তাঁর পূর্ণ সত্ত্বার অস্বীকৃতি এবং তিনি যার খবর দিয়েছেন, তা মিথ্যা সাবস্ত্য করা ও তাঁর অঙ্গীকারের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে

ইবনে উমার-ﷺ-বলেন, সেই সত্ত্বার শপথ, যাঁর হাতে ইবনে উমারের প্রাণ, তোমাদের কারো নিকট যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকে।

অতঃপর সে যদি সমস্ত সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেয়, তবে আল্লাহ তা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে ভাগ্যের উপর ঈমান আনবে। অতঃপর স্বীয় কথার সমর্থনে নবী করীম-ﷺ-এর এই বাণী পেশ করেন,

((الإِيْمَانُ أَنْ تُـؤْمِنَ بِـالله وَمَلائِكَتِـهِ وَكُتُبِـهِ وَرُسُـلِهِ وَاليَـوْمِ الآخِـرِ، وَتُـؤْمِنَ بِالقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) [رواه مسلم]

"ঈমান হল, তুমি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুলের উপর, তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর এবং শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর তুমি বিশ্বাস করবে ভাগ্যের ভাল-মন্দেকে।"

উবাদা ইবনে সামিত-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর পুত্রকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন, হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না এই অবগতি লাভ করবে যে, যে বিপদ তোমার উপর এসেছে, তা অবধারিত ছিল। আর যা তোমার উপর আসেনি, তা আসারই ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةَ)) [رواه أبوداود]

সর্ব প্রথম আল্লাহ যে জিনিস সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, লিখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কি লিখব, তিনি বললেন কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সৃষ্টি হবে, তাদের সকলের ভাগ্য লিখ। হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে এটাও বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي))

“যে ব্যক্তি এর বিপরীত ধারণা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সে আমার উম্মতের দলভুক্ত হবে না।” ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

((أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَة))

“সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ কলম সৃষ্টি ক’রে বলেন, লিখ। তখন তা শেষ দিবস পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার ছিল, তা লিখে দেওয়ার কাজে লেগে গেল।” ইবনে ওয়াহাবের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ))

“যে ব্যক্তি ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তাকে আল্লাহ আগুন দিয়ে জ্বালাবেন।” মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে ইবনে দায়লামী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ فَحَدَّثَنِي

بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ)) [حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه]

আমি উবাই ইবনে কা'বের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, অমার অন্তরে ভাগ্যের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তাই তুমি কোনো হাদীস বর্ণনা কর, হতে পারে আল্লাহ তা আমার অন্তর থেকে দূর করে দিবেন। তখন তিনি বলেন, তুমি যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা ব্যয় কর, তো আল্লাহ তা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি ভাগ্যের উপর ঈমান আনবে। জেনে রাখবে, যে বিপদ তোমার উপর এসেছে, তার আসা অটল ছিল। আর যা আসেনি, তা আসারই ছিল না। তুমি যদি এর বিপরীত ধারণা নিয়ে মৃত্যুবরণ কর, তবে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। দায়লামী বলেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান এবং যায়েদ ইবনে সাবেত-ﷺ-দের নিকট এলে, তাঁরাও এই ধরনের হাদীস নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি সহী। ইমাম হাকিম তাঁর সহী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। ভাগ্যের উপর ঈমান আনা ফরয হওয়ার বর্ণনা।

২। তার উপর ঈমান আনার পদ্ধতির বর্ণনা।

৩। যে তার উপর ঈমান আনে না, তার আমল বরবাদ।

৪। এই অবগতি করানো যে, ভাগ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না।

৫। প্রথম সৃষ্টের উল্লেখ।

৬। কলম তখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সবই লিখে ফেলেছে।

৭। যে ব্যক্তি ভাগ্যের উপর ঈমান আনে না, তার থেকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ- দায়ত্বমুক্ত।

৮। আলেমদের জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ দূর করা ছিল সালফে সালেহীনদের তরীকা।

৯। উলামারা সংশয় দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত জাওয়াব দিতেন এবং তাদের কথাকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে সম্পর্কিত করতেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

কুরআন ও হাদীস এবং উম্মতের ঐক্যমত দ্বারা এ কথা সুবিদিত যে, ভাগ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, ঈমানের রুকন সমূহের অন্যতম রুকন। তাই এই আক্বীদা রাখতে হবে যে, আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়। তিনি যা চান না, তা হয় না। যে এর উপর বিশ্বাস না রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে না। কাজেই আমাদের কর্তব্য ভাগ্যের প্রত্যেক স্তরের উপর ঈমান আনা। বিশ্বাস করবো যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে অবহিত। যা কিছু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, তা সবই তিনি লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রত্যেক জিনিস তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁর মহা শক্তি ও পরিচালনার ভিত্তিতে পরিচালিত। আর ভাগ্যের উপর ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন স্বীকার করে নিবে যে, আল্লাহ বান্দাদেরকে তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করেন না। বরং তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার এবং অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা দান করেছেন।

ছবি তোলা প্রসঙ্গে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((قَالَ اللهُ تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً))

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, “সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে, যে আমার মত সৃষ্টি করতে যায়। তোমাদের শক্তি থাকলে একটি কণা অথবা একটি দানা কিংবা একটি যব পরিণাম কোনো বস্তু সৃষ্টি কর তো দেখি।” (বুখারী-মুসলিম)

وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ))

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “কিয়ামতের দিন এমন মানুষের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর হবে, যে আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ তৈরী করবে।” (বুখারী-মুসলিম)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ))

মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, “প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে। সে যেসব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছ, তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরী করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।

وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوْعاً: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ))

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে মার্ফূ সূত্রে বর্ণিত, “যে

ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো মূর্তি বা ছবি নির্মাণ করবে, তাকে তাতে আত্মা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। আর সে আত্মা দিতে পারবে না।”

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ: قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ))

মুসলিম শরীফে আবুল হায়্যাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আলী-ﷺ-বলেন, আমি কি তোমাকে ঐ কাজে পাঠাবো না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? আর তা হল, কোনো মূর্তি পেলে তা মিটিয়ে দেবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখলে, তা সমান করে দিবে।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। ছবি নির্মাতাদের কঠোর পরিণতি।

২। এর কারণ কি তারও হুঁশয়ারী দেওয়া হয়েছে। আর তা হল,এতে আল্লাহর সাথে বেআদবী করা হয়। যেমন, তিনি বললেন, ‘সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে হতে পারে, যে আমার মত সৃষ্টি করতে যায়।

৩। আল্লাহর মহাশক্তির এবং চিত্রকারদের অক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে। যেমন, তিনি বলেন, তোমাদের শক্তি থাকলে একটি কণা অথবা একটি দানা কিংবা একটি যব পরিমাণ কোনো বস্তু সৃষ্টি কর তো দেখি।

৪। পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, ছবি নির্মাতারা মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশী শাস্তির সম্মুখীন হবে।

৫। মহান আল্লাহ প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে এমন জীব সৃষ্টি করবেন, যা ছবি নির্মাতাদেরকে জাহান্নামে আযাব দিবে।

৬। ছবি নির্মাতাদেরকে তাতে আত্মা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে।

৭। ছবি পাওয়া গেলে, তা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এটা পূর্বে উল্লিখিত অধ্যায়েরই অংশ। যাতে বলা হয়েছে যে,নিয়ত এবং কথা ও কাজে আল্লাহর শরীক বানানো জায়েয নয়। আর শরীক বলতে তাঁর সাথে কোনো কিছুর তুলনা করা, যদিও এই তুলনা অনেক দূর থেকে হয়। সুতরাং কোনো জীব-জন্তুর ছবি নির্মাণ করলে, তা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয় এবং তাঁর সৃষ্টিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়। যার কারণে শরীয়ত প্রণেতা এর জন্য ধমক দিয়েছে।

বেশী কসম খাওয়া প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]

“তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর।” (সূরা মায়েদা ৮৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ)) [أخرجاه]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কসম পণ্যদ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু তার বরকত (লাভ) নষ্ট করে।” বুখারী-মুসলিম)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهُ لَهُ بِضَاعَةً فَلا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلاَ يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ)) [رواه الطبراني بسند صحيح]

সালমান ফারসী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে পীড়াদায়ক শাস্তি। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দরিদ্য দাম্ভিক এবং সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে কসম না খেয়ে বেচা-কেনা করে না।” ইমাম তাবরানী সহী সনদে বর্ণনা করেছেন।

وَفِي الصَّحِيْحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؟ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ))

সহী বুখারীতে ইমরান ইবনে হুসাইন-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ।” ইমরান বলেন, নবী করীম-ﷺ-তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই। “অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে মানত করবে, কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের দেহে স্থূলত্ব প্রকাশ পাবে।”

وَفِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ))

বুখারীতেই ইবনে মাসঊদ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ।" অতঃপর এমন জাতির আবির্ভাব ঘটবে, যাদের কারো কসমের উপর সাক্ষ্য অতিক্রম করবে এবং তাদের সাক্ষ্যের উপর কসম অতিক্রম করবে।"

ইব্রাহীম নাখয়ী (রহঃ) বলেন, ছোটতে সাক্ষ্য দানের কারণে বড়রা আমাদেরকে শাস্তি দিতেন।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। কসম রক্ষা করার উপদেশ।

২। এই অবহতি করণ যে, কসমে পণ্যদ্রব্য চালু হয় এবং পরে তার বরকত নষ্ট করে।

৩। যে কসম ব্যতীত কেনা-বেচা করে না, তার শাস্তি কঠিন।

৪। এই সাবধানতা রয়েছে যে, ছোট ছোট কারণেও অপরাধ বড় আকার ধারণ করে।

৫। কসম তলব না করা সত্ত্বেও যারা কসম খায়, তাদের নিন্দাবাদ।

৬। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কর্তৃক তিনটি অথবা চারটি যুগের প্রশংসা এবং এই যুগের পর কি হবে তার উল্লেখ।

৭। সাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই যারা সাক্ষ্য দেয়তাদের নিন্দাবাদ।

৮। সালফে সালেহীনগণ সাক্ষ্য দানের কারণে ছোটদের মারতেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আসলে যার উপর কসম খাওয়া হয়, সেই জিনিসকে পাকা-পোক্ত করার জন্যই কসমের বিধান প্রণীত হয়েছে। আর স্রষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যও। তাই ওয়াজিব হল শপথ কেবর আল্লাহর নামে গ্রহণ করা। গায়রুল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করলে তা শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং আল্লাহকে পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করতে হলে, তাঁর কেবল তাঁর নামেই সত্য শপথ গ্রহণ করবে। অনুরূপ অধিকহারে কসম না খেয়ে তাঁর নামের সম্মান রক্ষা করবে। আর আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম এবং অধিকহারে কসম খাওয়া, তাঁর সম্মান পরিপন্থী, যা তাওহীদের প্রাণ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]

“আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকা-পাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না।” (সূরা নাহল ৯১)

وَعَن بُرَيْدَةَ، قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى الله، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: ((اغْزُوا بِاسْمِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ

أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكِ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِين، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا)) [رواه مسلم]

বুরাইদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর নির্বাচন করতেন, তখন তাকে আল্লাহকে ভয় করার এবং তার সাথী-সঙ্গী মুসলিমদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, "আল্লাহর নামে জিহাদ কর। যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, তাদের সাথে যুদ্ধ কর। তবে গণীমতের মালের খিয়ানত করবে না। চুক্তি ভঙ্গ করবে না।

শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি করবে না। শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয় বা তিনটি আচরণের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্যে থেকে যেটিই গ্রহণ করবে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে। যদি তারা তোমার এই আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। এরপর তুমি তাদের স্বগৃহ ত্যাগ করে মুহাজিরদের এলাকায় চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। আর তাদের জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যে সব লাভ লোকসান ও দায় -দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপরও কার্যকরী হবে। যদি তারা স্বগৃহ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের উপর আল্লাহর সেই বিধান কার্যকরী হবে, যা সাধারণ মুসলিমদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গণীমত ও ফায় থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমদের সাথে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে 'জিযয়া' (কর) প্রদানের দাবী জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের তরফ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। অর যদি তারা এ দাবী না মানে, তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা ক'রে তাদের সাথে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। আর যদি তোমরা কোনো দুর্গবাসীকে অবরোধ কর এবং তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা (রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব) চায়, তবে তুমি তাদেরকে আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলের যিম্মা দিবে না। বরং তাদেরকে তোমার ও তোমার সাথী-দের যিম্মাদায় রাখবে। কেননা, যদি তোমাদের ও তোমাদের সাথীদের যিম্মাদারী ভঙ্গ করা হয়, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী ভঙ্গ করার চাইতে বেশী গুরুতর নয়। আর যদি তোমরা কোনো দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ কর, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক অবতরণ করতে চায়, তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর অবতরণ না করিয়ে তাদেরকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর অবতরণ করতে দিবে। কেননা, তোমার জানা নেই যে, তুমি তাদের মাঝে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারবে কি না? (মুসলিম)

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা এবং মুসলিমদের যিম্মার মধ্যে পার্থক্য।
২। দু’টি বিষয়ের মধ্যে যার ক্ষতি কম তার নির্দেশ।
৩। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, “আল্লাহর নামে তাঁর পথে জিহাদ কর।”
৪। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, “আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা ক’রে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।”
৫। আল্লাহর ফয়সালা এবং আলেমদের ফয়সালার মধ্যে পার্থক্য।
৬। প্রয়োজনের সময় সাহাবীর এমন ফয়সালা করা, যার ব্যাপারে সে জানে না যে, এটা আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী হচ্ছে কি না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হল, এমন অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচতে ও বিরত থাকতে চেষ্টা করা, যে অবস্থায় শত্রুদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মার অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করার

আশঙ্কা থাকে। আর এই অবস্থায় যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে, তখন তা মুসলিমদের পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মার সাথে অবৈধ আচরণ করা হবে এবং আল্লাহর অসম্মান ও দুই ক্ষতিকর জিনিসের মধ্যে অধিকতর ক্ষতিকর জনিস সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। আর এ থেকেই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সতর্ক করেছেন। তাছাড়া এতে ইসলামকে হীন ও তুচ্ছ ভাবা হয় এবং কাফেরদেরকে এর (অঙ্গীকার ভঙ্গ করার) প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। কারণ, অঙ্গীকার পূরণ করা হল, ইসলামের সৌন্দর্য-সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ন্যায়পরায়ণ শত্রুদেরকে এ কথার প্রতি উৎসাহিত করে যে, ইসলাম শ্রেষ্ঠ্যতম এক ধর্ম এবং তার অনুসরণও করে।

আল্লাহর উপর কসম খাওয়া

عَنْ جُنْدَبِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : ((قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)) [رواه مسلم]

জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম ক'রে বলছি, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। তখন মহান আল্লাহ বললেন, এ কে যে আমার উপর কসম ক'রে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম।" (মুসলিম) আবূ হুরাইরা-ﷺ-বলেন, একথা যে বলেছিল, সে একজন ইবাদতকারী বান্দা ছিল। তার একটি কথার কারণে দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়ে গেল।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। আল্লাহর উপর কসম খাওয়া ব্যাপারে সতর্ককরণ।

২। জাহান্নাম আমাদের জুতোর ফিতের থেকেও নিকটে হওয়া।

৩। জান্নাতও অনুরূপ।

৪। এই হাদীসে সেই হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, 'মানুষ কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে জাহান্নামের গিয়ে পতিত হয়।"

৫। কোনো কোনো সময় মানুষের মুক্তি এমন কারণেও সাধিত হয়, যা তার নিকট অত্যধিক অপছন্দনীয় ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহর উপর কসম খাওয়া এবং আল্লাহকে সুপারিশী হিসাবে সৃষ্টির সামনে পেশ করা, আল্লাহর শানে অশিষ্টতা। আর এটা তাওহীদ পরিপন্থী জিনিস। কারণ, আল্লাহর উপর কসম খাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মগর্ব এবং আল্লাহর সাথে অশিষ্টতার পর্যায় পড়ে। এই বিষয়গুলো মেনে না নেওয়া পর্যন্ত করো ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না।

আল্লাহকে সুপারিশী হিসাবে সৃষ্টির সামনে পেশ করা যায় না

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نُهِكَتِ الْأَنْفُسُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ!)) فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

((وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ)) [وهَذأ الحديث ضعيف]

জুবায়ের ইবনে মুতয়িম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষগুলো শেষ হয়ে গেল, পরিজন ক্ষুধায় কাতর এবং মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল, তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণের দুআ করুন! আমরা আল্লাহকে আপনার সামনে এবং আপনাকে আল্লাহর সামনে সুপারিশী হিসাবে পেশ করছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আশ্চর্যান্বিত হয়ে "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করলেন। তিনি অব্যাহতভাবে এমন করে "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করছিলেন যে, তার প্রতিক্রিয়া সাহাবীদের মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেল। অতঃপর নবী করীম-ﷺ-বললেন, "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি জান আল্লাহ কে? আল্লাহর সম্মান-মর্যাদা এর অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহকে কোনো সৃষ্টির সামনে সুপারিশী হিসাবে পেশ করা যায় না।" (হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসটি দুর্বল)।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার কথার খণ্ডন করেছেন, যে বলেছে, আমরা আল্লাহকে আপনার সামনে সুপারিশী হিসাবে পেশ করছি।

২। এই বাক্যের কারণে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল যে, তার প্রতিক্রিয়া সাহাবীদের মুখমণ্ডলেও লক্ষ্য করা গেল।

৩। তিনি 'আপনাকে আল্লাহর সামনে সুপারিশী হিসাবে পেশকরছি।' এ কথার খণ্ডন করেন নাই।

৪। ‘সুবহানাল্লাহ’ তাফসীর সম্পর্কে অবহিত করণ।
৫। মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বৃষ্টির জন্য দুআ করতে বলতেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণঃ

আল্লাহকে সুপারিশী হিসাবে সৃষ্টির সামনে পেশ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাঁর মহান সত্ত্বা মাধ্যম হওয়ার বহু ঊর্ধ্ব। কেননা, সাধারণতঃ যাকে মাধ্যম মানানো হয়, তার মর্যাদা-সম্মান তার থেকে কম হয়, যার সামনে মাধ্যম পেশ করা হয়। আর এতে আল্লাহর সাথে বে-আদবী করা হবে। কাজেই তা ত্যাগ করতে হবে। কারণ, সুপারিশকারীরা তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারবে না। সকলেই তো তাঁর নিকট ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তাহলে আল্লাহকেই কেমন করে সুপারিশকারী বানানো যায়? তাঁর সত্ত্বা এমন মহান ও বিশাল, যাঁর সামনে গর্দানসমূহ ঝুঁকে যায় এবং সার্বভৌমত্ব যাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

তাওহীদের সমর্থনে এবং শির্কের পথ বন্ধ করণে নবী করাম-ﷺ-এর তৎপরতা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّخِّير رضي الله عنه، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: ((السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: ((قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ)) [رواه أبو داود بسند جيد]

আব্দুল্লাহ ইবনে শিক্ষীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বনী আমেরের একটি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা

বললাম, আপনি আমাদের সম্রাট। তখন তিনি বললেন, সকলের সম্রাট হলেন, বরকতময় মহান আল্লাহ। আমরা বললাম, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের কথা বা এই ধরনের কোনো কোনো কথা বলতে পার। তবে সাবধান! শয়তান যেন তোমাদেরকে (বাড়াবাড়ি করতে) উৎসাহত না করে।" (হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)।

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَ سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولُهِ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِيَ الَّتِيْ أَنْزَلَنِي اللهُ عز وجل)) [رواه النسائي بسند جيد]

আনাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং উত্তম ব্যক্তির সন্তান। আপনি আমাদের সরদার এবং আমাদের সরদারের সন্তান। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের কথা বল, তবে সাবধান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল। আমি চাইনা যে, তোমরা আমাকে সেই স্থানের আরো ঊর্ধ্বে তুলে দাও, যে স্থান মহান আল্লাহ আমাকে দান করেছেন।" (হাদীসটি ইমাম নাসায়ী উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)।

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। বাড়াবাড়ি করা থেকে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

২। যদি কাউকে ‘হে আমাদের সরদার’ বলা হয়, তাহলে তার কি বলা উচিত।

৩। হক্ক কথা বলা সত্ত্বেও রাসূল-ﷺ-তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, শয়তান যেন তোমাদেরকে ফাঁসিয়ে না দেয়।’

৪। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, “আমি চাইনা যে, তোমরা আমাকে আমার উপযুক্ত স্থানের ঊর্ধ্বে তুলে দাও।”

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের মত একটি অধ্যায় পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। লেখক এখানে তাওহীদের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য ক’রে ঐ ধরনের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। বস্তুতঃ তাওহীদে পূর্ণতা অর্জন এবং তার হেফাযত ও সংরক্ষণ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এমন সকল পথ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা হবে। তবে উভয় অধ্যায়ের মধ্যে পার্থক্য হল, প্রথম অধ্যায়ে তাওহীদের সমর্থন করা হয়েছে কর্মের দ্বারা সম্পাদিত শির্কের পথ বন্ধ করে। আর এই অধ্যায়ে তার হেফাযত করা হয়েছে কথার দ্বারা সংঘটিত শির্কের পথ বন্ধ করে। অতএব প্রত্যেক বাড়া-বাড়িমূলক কথা-বার্তা যার দ্বারা শির্কে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা থেকে বাঁচা অত্যাবশ্যক। আর এই ধরনের কথা ত্যাগ না করলে তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করবে না। সার কথা হল, তাওহীদের শর্তাবলী, তার রুকন-সমূহ, তার পরিপূরক বিষয়গুলো এবং যে জিনিস তাকে বাস্তব রূপ দান করে, এগুলো সব সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে এবং তাওহীদ বিনষ্টকারী প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় থেকে বাঁচতে না পারলে, তা পূর্ণতা লাভ করবে না। ইতি পূর্বেও বিস্তারিত অনেক আলোচনা হয়েছে যা এই বিষয়কে আরো পরিষ্কার করে দেয়।

অধ্যায়
মহান আল্লাহর বাণী

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ [الزُّمر:٦٧]

"ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে।" (সূরা যুমার ৬৭)

عَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنْ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে, এক ইয়াহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ, আমরা তো আল্লাহকে এরূপ পাই যে, তিনি আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে, ভু-মণ্ডলকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, সমুদয় পানিকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত সমাধিস্থ বস্তুকে এক আঙ্গুলে এবং সকল সৃষ্টিকুলকে এক আঙ্গুলে ধারণ ক'রে বলবেন, আমিই সম্রাট। একজন ইয়াহুদী পণ্ডিতের মুখ থেকে সত্যের এই ঘোষণা শুনে নবী করীম-ﷺ-এমনভাবে হেসে গেলেন যে তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

“ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে।”

وفي رواية لمسلم: ((وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ))

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, “পাহাড়-পর্বত ও বৃক্ষাদি এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। অতঃপর ওগুলো ঝাঁকাবেন আর বলবেন, আমিই মহারাজ, আমিই সম্রাট।”

وفي رواية للبخاري ((يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ، وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ)) [أخرجاه]

আর বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, আকাশ মণ্ডলকে এক আঙ্গুলে, সমুদয় পানি ও ভু-গর্ভস্থিত সকল বস্তুকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন।”

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعاً: ((يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ السَّبْعَ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟))

মুসলিম শরীফে ইবনে উমার-رضي الله عنه-থেকে মার্ফু সূত্রে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে আকাশ মণ্ডলকে মুড়িয়ে স্বীয় ডান হাতে ধারণ ক’রে বলবেন, আমি মহারাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অহঙ্কারীরা কোথায়?

অতঃপর সপ্ত যমীনকে মুড়িয়ে স্বীয় বাম হাতে ধারণ ক'রে বলবেন, আমিই মহারাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অহঙ্কারীরা কোথায়?"

وَرُوِىَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: ((مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُوْنَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلاَّ كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ))

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, সপ্তাকাশ ও সপ্ত যমীন রহমানের হাতের তালুতে ঐ রকম ক্ষুদ্র, যেমন তোমাদের কারো হাতে সরিষার দানা থাকে।"

وَقَالَ ابنُ جَرِيْرٍ: حَدَّثَنِي يُوْنُس أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسِيِّ إلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ))

ইবনে জারির বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউনুস, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওয়াহাব, তিনি বলেন, ইবনে যায়েদ বলেছেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঐ রকমই হয়, যেমন একটি ঢালের মধ্যে কয়েকটি দিরহাম ফেলে রাখা হয়।

وَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَا الكُرْسِيُّ فِي العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيِّ فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ))

আবূ যার-রাঃ-বলেন, আমি রাসূল-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, 'আরশের মধ্যে কুরসী অবস্থান ঠিক ঐ রকমই, যেমন যমীনের কোন

এক ময়দানে একটি লোহার আংটিকে ফেলে দেওয়া হয়।'

وَعَن ابنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ، قَالَ: ((بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِيْ تَلِيْهَا خَمْسَمَائَةُ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسَمَائَةُ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ خَمْسَمَائَةُ عَامٍ، بَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسَمَائَةُ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ، لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ)) [أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق]

ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ এবং তার কাছাকাছি আকাশের মধ্যে পাঁচশত বছরের দূরত্ব রয়েছে। আর প্রত্যেক দুই আকাশের মধ্যে পাঁচশত বছরের দূরত্ব রয়েছে। সপ্তাকাশ ও কুরসীর মধ্যে পাঁচশত বছরের ব্যবধান রয়েছে। আর কুরসী এবং পানির মধ্যে পাঁচশত বছরের ব্যবধান রয়েছে। আর আল্লাহর আরশ রয়েছে পানির উপরে। আর আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন। তোমাদের আমলের কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না। এই হাদীসটি ইবনে মাহদী বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হতে, তিনি আ'সেম থেকে, তিনি যির্র হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ হতে। এইভাবে মাসঊদী আ'সেম হতে, তিনি আবী ওয়ায়েল হতে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এই তথ্য দিয়েছেন হাফিয যাহবী (রহঃ)। তিনি বলেন, এই হাদীস আরো অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَبَّاس بنْ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟)) قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ))

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “তোমরা জান কি আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?” আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, “উভয়ের মধ্যে দূরত্ব হল পাঁচশত বছরের পথ। প্রত্যেক দুই আসমানের মধ্যে ব্যবধান হল পাঁচশত বছরের পথ। প্রত্যেক আসমানের গভীরতা হল পাঁচশত বছরের পথ। আর সপ্তাকাশ ও আরশের মধ্যে রয়েছে বিরাট এক সমুদ্র। সেই সমুদ্রের ঊর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যে ততটাই ব্যবধান রয়েছে, যতটা আসমান ও যমীনের মধ্যে। মহান আল্লাহ তার উপর সমাসীন। আদম সন্তানের আমলের কোনো কিছুই তাঁর নিকট গুপ্ত নয়।” (আবূ দাউদ)

কতিপয় মসলা জানা গেল,

১। সূরা যুমারের আয়াতের তাফসীর।

২। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর যুগে এই সব জ্ঞানের এবং তার অনুরূপ জ্ঞানের কথার প্রচলন ছিল, যা তারা অস্বীকারও করত না এবং তার অপব্যাখ্যাও করতো না।

৩। যখন ইয়াহুদী বিদ্যান রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট তার উল্লেখ করল, তখন তিনি তার সত্যায়ন করলেন ও তার যথার্থতার ভিত্তিতে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল।

৪। ইয়াহুদী বিদ্যানের মুখে এই বিরাট জ্ঞানের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর হাসি ও আনন্দের প্রকাশ।

৫। সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর দু’টি হাতের উল্লেখ। আকাশমণ্ডল ডান হাতে এবং ভু-মণ্ডল অপর হাতে অবস্থিত থাকা।

৬। অপর হাতকে বাম হাত নামে আখ্যায়িত করণ।

৭। এই ক্ষেত্রে অত্যাচারীদের এবং অহঙ্কারীদের উল্লেখ।

৮। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণী, “যেমন তোমাদের কারো হাতে সরিষার দানা।

৯। আসমানের তুলনায় কুরসীর বিশালতা।

১০। কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতা।

১১। আরশ হল কুরসী ও পানি ব্যতীত অন্য বস্তু।

১২। দুই আসমানের মধ্যেকার দূরত্ব কত?

১৩। সপ্তাকাশ এবং কুরসীর মধ্যে দূরত্ব কত?

১৪। কুরসী ও পানির মধ্যে দূরত্ব কত?

১৫। আরশ পানির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৬। আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন।

১৭। আসমান ও যমীনের মধ্যে ব্যবধান কত?

১৮। প্রত্যেক আসমানের গভীরতা হল পাঁচশত বছরের পথ।

১৯। সপ্তাকাশের উপরে যে সমুদ্র তার ঊর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যে ব্যবধান হল পাঁচশত বছরের পথ। মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

“ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি।” লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর কিতাবকে এই অধ্যায়ের মাধ্যমে সমাপ্তি করেছেন। আর এতে এমন সব শরীয়তী উক্তির উল্লেখ করেছেন, যা মহান প্রতি-পালকের মাহাত্ম্য, তাঁর বিরাটত্ব এবং তাঁর গৌরব ও মহিমাকে প্রমাণিত করে ও সকল সৃষ্টিকুল তাঁর সামনে অবনত হয়ে তাঁর গৌরব ও মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য দেয়। কেননা, এই মহান গৌরব ও পূর্ণ গুণের অধিকারী হওয়াই সব থেকে বড় প্রমাণ যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনিই প্রশংসিত। অত্যধিক সম্মান ও বিনয় এবং যাবতীয় ভালবাসা ও ইবাদত তাঁরই জন্য নিবেদন করা অপরিহার্য। তিনিই সত্য। তিনি ব্যতীত সবই বাতিল ও অবাস্তব। আর এটাই হল প্রকৃত তাওহীদ এবং তার প্রাণ।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরকে তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে তাঁর প্রতি ভালবাসায় ভরে দেন। তিনিই সর্বাধিক দাতা ও বড় মেহেরবান।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬	মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য
১৪	তাওহীদের ফযীলত
২১	যে তাওহীদের বস্তব রূপ দিবে
২৭	শির্ককে থেকে বিরত থাকা
৩০	‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য প্রদান
৪২	বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার জন্য কোন জিনিস ব্যবহার করা
৪৭	ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গে
৫০	বৃক্ষ ও পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করা
৫৪	গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা
৬১	গায়রুল্লাহর নামে মানত করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত
৬২	গায়রুল্লাহর আশ্রয় কামনা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত
৬৩	গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া শির্কের অন্তর্ভুক্ত
৬৭	আল্লাহর বাণী
৭২	আল্লাহর বাণী
৭৭	শাফাআ’ত প্রসঙ্গে
৮২	‘আপনি যাকে চান, তাকে হেদায়াত দিতে পারেন না’
৮৫	নেক লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা
৯১	কবরের নিকট আল্লাহর ইবাদত করা
৯৭	নেক লোকদের কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা
৯৮	তাওহীদের প্রতিষ্ঠায় রাসূল-ﷺ-এর তৎপরতা
১০১	এই উম্মতের অনেকেই মূর্তিরপূজা করবে

১০৭	যাদু প্রসঙ্গে
১০৯	যাদুর কয়েকটি প্রকার
১১২	দৈবজ্ঞ ইত্যাদি প্রসঙ্গে
১১৫	যাদুর প্রতিরোধ যাদু প্রসঙ্গে
১১৭	অলক্ষী-কুলক্ষণ প্রসঙ্গে
১২২	জ্যোতিষ বিদ্যা প্রসঙ্গে
১২৪	তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা
১২৮	আল্লাহর বাণী
১৩২	মহান আল্লাহর বাণী
১৩৬	আল্লাহর বাণী
১৩৮	আল্লাহর বাণী
১৪২	আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণ
১৪৬	‘রিয়া’ (লোক দেখানী কাজ) প্রসঙ্গে
১৫০	দুনিয়া অর্জনের জন্য ভাল কাজ করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত
১৫১	হালাল ও হারামের ব্যাপারে নেতাদের আনুগত্য করা
১৫৫	আল্লাহর বাণী
১৫৭	আল্লাহর নাম ও তাঁর গুণাবলীকে অস্বীকার করলে
১৫৯	আল্লাহর বাণী
১৬১	আল্লাহর বাণী
১৬৪	যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে পরিতৃপ্ত হয় না
১৬৫	আল্লাহর এবং তোমার ইচ্ছা-এই উক্তি প্রসঙ্গে
১৬৮	যে সময়কে গালি দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল

১৭০	কাযীউল কুযাত ইত্যাদি নামকরণ প্রসঙ্গে
১৭১	মহান আল্লাহর নামসমূহের সম্মান ক'রে নাম পরিবর্তন করা
১৭২	আল্লাহর যিকর, কুরআন কিংবা রাসূলের সাথে বিদ্রূপ করা
১৭৫	আল্লাহর বাণী
১৮১	আল্লাহর বাণী
১৮৩	আল্লাহর বাণী
১৮৬	'আসসালামু আ'লাল্লাহ' বলা যায়া না
১৮৭	হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করে দাও
১৮৯	আমার দাস আমার দাসী বলবে না
১৯০	যে আল্লাহর নিকট চায়, সে প্রত্যাখ্যাত হয় না
১৯১	আল্লাহর মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে জান্নাত চাইতে হয়
১৯২	'যদি' কথা প্রসঙ্গে
১৯৫	বায়ুকে গালি দেওয়া নিষেধ
১৯৯	যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে
২০৩	ছবি তোলা প্রসঙ্গে
২০৬	বেশী কসম খাওয়া প্রসঙ্গে
২০৯	আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী প্রসঙ্গে
২১৩	আল্লাহর উপর কসম খাওয়া
২১৬	শির্কের পথ বন্ধ করণে নবী করাম-ﷺ-এর তৎপরতা
২১৯	মহান আল্লাহর বাণী